যিশু হৃদয়ের উপচে-পড়া ভালবাসা

উপাসনায় পরিচালকের-যাজকের যথার্থ আচরণ

করোনাভাইরাস আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে

লকডাউন

বিদায়ের দুই বছর

নির্জন ব্লেইস সরকার

Nirjon Blaise Sarker
জন্ম : ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বাবা নির্জন-
তুমি ছিলে, তুমি আছো,
তুমি থাকবে চিরদিন আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

প্রকৃতি ও জীবন তার আপন গতিতেই চলবে এটাই নিয়ম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো তার অতি প্রিয়জনকে হারানো। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে বছর চলে এলো যে দিনে পরম পিতা বাহ্যিকভাবে তোমাকে আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে নিয়েছে। সেদিন ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন ৪, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ যেদিন পরম পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তোমাকে। আর একইভাবে সেদিন ৭ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ ছিল সর্বোচ্চ কষ্টের দিন যেদিন পরম পিতার কাছে আমাদের ছেড়ে আবার চলে গেলে।

বাবা, তুমি তোমার মায়ের গলায় ধরে মাত্র দুবছর আগেই বলেছিলে "*মা তুমি আমার পৃথিবী আর কখনো আমার হার্ট আমি সারাজীবন তোমার পৃথিবীতে আমি বেঁচে থাকবো মা কিন্তু আমার হার্টটা শুধু মৃত থাকবে।*" সত্যি বাবা তুমি আমার পৃথিবীতে বেঁচে আছো, কিন্তু তোমার হার্টটা মৃত। তুমি আমার হৃদয়েই বেঁচে আছো তোমার সমস্ত সৃজনশীলতাকে নিয়ে। আর আমরা এটা ভাবি বলেই আমরাও বেঁচে আছি বাবা। তুমি একটু বেশি আগেই তোমার প্রিয় যিশুর কাছে চলে গেছ কারণ এ বিষয়ে তো জীবিত কোনো মানুষের হাত নেই একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তাঁর পরিকল্পনা। আমি এটা ভেবে কষ্টের মাঝেও আনন্দ পাই যে, তুমি ছিলে একজন বহু গুণের অধিকারী মূল্যবোধ সম্পন্ন ছেলে আর তাই মানুষকে ভালবেসেই পৃথিবী ত্যাগ করেছ। তোমার এই ভাল শব্দটা ভেবেই কেবল আমরা বেঁচে আছি।

বাবা, মনেই হয় না যে দুইটা বছর পার হয়ে গেল। মনে হয় সার্বক্ষণিকই তোমাকে দেখছি এবং ভাবছি হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়েছ আবার চলে আসবে বলে অপেক্ষায় আছি। সোনাবাবা তোমার তো যাওয়ার কথা ছিল না কেন এমনটি হলো বলতে পারব জানি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মৃত্যুই মানুষের শেষ ঠিকানা। এই পৃথিবীতে কেবল আমরা স্বল্প সময়ের জন্য বেড়াতেই আসি। সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে ঈশ্বরের রাজ্যে সেটা আমাদের আসল ঠিকানা। কিন্তু তারপরও প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত তোমার অভাব অনুভব করি যা কোনভাবেই প্রকাশ করা যায় না যদিও ঈশ্বরের মাধ্যমে তোমার দিদি ও দাদাকে পাঠিয়েছ আমাদের সান্নিধ্যে। বাবা মা বলে আমার হৃদয়টার কষ্ট কমানোর চেষ্টা করে। আমাদের হৃদয়টা যেন ভেঙে যাচ্ছে, কোন ভাষা আসছে না মনে, পিছনে বসে হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। তুমি ছিলে আমাদের হৃদস্পন্দন। আচমকা এক কালবৈশাখী এসে সে হৃদস্পন্দনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বাবা, তোমার ঘর তোমার সখের ছবি, খেলার জিনিস, ক্রুশে বিদ্ধ যিশুর ছবি দিয়ে সাজিয়েছি। পুরোঘরটি তোমার জিনিস দিয়ে স্মৃতিময় হয়ে আছে। শুধু তুমি শারীরিকভাবে উপস্থিত নাই। তাই তোমার ছবিটাই প্রতিদিন বুকে জড়িয়ে থাকি আর বলি বাবা তোমাকে অনেক ভালবাসি, তুমি থাক তোমার প্রিয় যিশুর কাছে। আমরা কেবল আছি একটি ছায়াহীন, মালিহীন কষ্টের বাগানে। তোমার প্রদানকৃত অসংখ্য স্মৃতি যেমন অঙ্কিত অসংখ্য ছবি, গান, অসংখ্য গল্পের বই, ধর্মীয় বই ও পবিত্র শিশুতোষ বাইবেল, প্রিয় জামা, গিটার, হারমোনিয়াম-তবলা, সৃজনশীল খেলনা, অসংখ্য ছবি, কলাপিয়ার কার্যক্রমের জিনিস, তোমার প্রতিযোগিতার অনেক উপহার, মূল্যবোধ সম্পন্ন সংগৃহীত অসংখ্য বাক্য, চিত্রিত ইত্যাদি হৃদয়ে ধারন করেই বেঁচে আছি ও থাকবো। তোমার প্রিয় কিটটিও (জপ) আর বেঁচে নেই। তোমার দাদু ও বড় কাকাও তোমার কাছে চলে গিয়েছে। তোমার কথা স্মরণ করে তাদের কবরে তোমার পক্ষে মাটি দিয়েছি। তোমার হাজারো প্রিয় বন্ধুরা ও শিক্ষকগণ তোমাকে প্রচুর মিস করে। নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জীবনের সামনের পথ এগুতে যখন খুব কষ্ট হচ্ছিল ঠিক তখনই বুঝতে পারলাম তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছো। আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গের দূত, পিতা তোমাকে তার শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। একদিন আমরাও প্রভুর রাজ্যে তোমার কাছে যাব।

Nirjon Blaise Sarker

শোকাহত-

মা ও বাবা (শুভ্রা ও রোজেন) এবং ঠাকুমা, কাকা, কাকীমা ও পিসা, পিসিমা ও প্রিয় মাসিমা (রেখা ও লিপিকা), প্রিয় মামা (মঞ্জু, দিলীপ, মলয়, বিপুল) ও প্রিয় মামী (আগ্নেস, শান্তি, সুকলা, স্বর্ণা, জলি ও হিমানী) প্রিয় দাদা (মিঠু, সাকিব, রাফি, প্রবীর, পল্লব, জুয়েল, অ্যাপ্লেডোনাল্ড, জেমী, শিশির, মিরেল, বনান্ত) ও প্রিয় বৌদি- (মিতা, সাথি, রুপালী ও দিয়া)-প্রিয় দিদি (সি. কৃষ্ণা-শান্তিরাণী, সি. জোয়া-সিস্টারস্ অব চ্যারিটি, জেরুলী, শিপ্রা, জুলিয়েট, তনুশ্রী, মৌটুসী), প্রিয় বোন (মৌ, দীপিতা, অমৃতা, প্রিয়াঙ্কা ও মুক্তা), প্রিয় ভাই (প্রান্ত ও প্রান্তর, দীপ, দীপ্ত) প্রিয় ভাইঝি (রূপম, ঐশি, দিলাক্ষি, ঐন্দ্রিলা), প্রিয় ভাগ্নি/ভাগ্নে (অপ্সরী, এঞ্জেল, সার্থক, সৌর্য, এইডেন, এলিনা) প্রিয় ভাইপো- স্পর্শ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২৪
৪ - ১০ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২০ - ২৬ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

লকডাউন!

কোভিড-১৯ করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, বিস্তার ও তাতে আক্রান্ত ব্যক্তির ভয়াবহ কষ্ট বিশ্বের মানুষকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। শিল্প ও প্রযুক্তিতে অতি সমৃদ্ধ দেশ থেকে শুরু করে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর জনগণও ধীরে-ধীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই এককাতারে নামিয়ে এনেছে করোনাভাইরাস। সারাবিশ্ব দীর্ঘ সময় ধরে সংগ্রাম করছে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস মহামারীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কিন্তু এখনো তেমন কোন ভাল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইউরোপ, আমেরিকা জয় করে করোনাভাইরাস এশিয়া ও আফ্রিকাকে কাবু করতে চলেছে। প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে- মানুষ যখন তার উদ্ভাবনী ও মেধা দিয়ে চাঁদ জয় করে মঙ্গলকে জয় করতে চলেছে তখন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করোনাভাইরাসকে জয় করতে পারছে না কেন? এই কেন - এর উত্তর পেতে গেলে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়তো দরকার। কিন্তু খালি চোখে বলা যেতে পারে, আমরা করোনাকে নিয়ন্ত্রণ ও জয় করতে চাই কি? করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কোন বৈশ্বিক কর্মোদ্যোগ তেমন একটা চোখে পড়ছে না। অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী; যেমন: টিকা আবিষ্কার ও প্রয়োগ, উন্নত চিকিৎসা সামগ্রী সহজলভ্য করা, করোনাকাল মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা দান করা ইত্যাদি। কিন্তু তাতেও তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছেন না। করোনা চিকিৎসা সামগ্রী ও টিকা নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যবসা ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। দেখা যাচ্ছে ধনীদেশগুলো করোনার টিকা পাচ্ছে। টিকা সরবরাহ করতে গিয়ে শুরু হয়েছে রাজনীতি। জীবননীতি থেকে রাজনীতি বড় হয়ে ওঠছে বলে মানুষ করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় পোপ ফ্রান্সিস বলেন, একজনও করোনা আক্রান্ত থাকলে আমরা কেউই নিরাপদ নই। তাই সকলের জন্যই টিকার ব্যবস্থা করা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কর্তব্য। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতায় ও মানবিকতায় আমাদের দেশের কিছু মানুষ অতি তাড়াতাড়িই করোনার টিকা পেয়েছেন এবং আরো অনেকের পাবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে যাওয়ায় তা পেতে দেরি হচ্ছে। আর এই সময় ক্ষেপণে করোনায় আক্রান্ত হবার সংখ্যাও দিন-দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এমনিতর অবস্থায় করোনা নিয়ন্ত্রণে অন্যতম কার্যকরী পদ্ধতি হতে পারে লকডাউন। আর সরকার সে পথেই হাঁটছে। যদিও তা একটু দেরিতে।

করোনাভাইরাসের সাথে লকডাউন শব্দটিও বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেছে। গত বছরে সারাদেশে লকডাউন দিয়ে করোনার বিস্তারকে কিছুটা রোধ করা সম্ভব হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন। কিছুদিন আগে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থাও করোনা গ্রাসে ভেঙ্গে পড়েছিল। কঠোর লকডাউন প্রদান ও তা যথাযথভাবে পালনের মধ্যদিয়ে তারা তাদের অবস্থার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে বলে মিডিয়া প্রকাশ করছে। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবারও কঠোর লকডাউনের পথে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে তা যেন যথাযথভাবে পালন করা হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কঠোর লকডাউন হলে দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও প্রান্তিক জনগণের খাদ্য কষ্ট তীব্র আকার ধারণ করে। পেটে ক্ষুদা থাকলে কেউই ঘরে থাকতে চাইবে না - তা গত লকডাউনে স্পষ্ট হয়েছে। তাই কঠোর লকডাউনের আগে খাদ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিরাপত্তা দান করা আবশ্যক। সরকার, প্রশাসনের সাথে সাথে জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে যথার্থভাবে লকডাউন পালন করে করোনাভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে আনয়নের জন্য। মনে রাখতে হবে, আমরা যতো বেশি সচেতন হবো; করোনা ভাইরাসও তত বেশি তাড়াতাড়ি দুর্বল হবে এবং আমরা নতুন স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবো।

করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে কঠোর লকডাউন আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে মানসিকতা ও মানবিকতার লকডাউন উন্মুক্ত করতে। শারীরিকভাবে একজন আরেকজনের কাছে যেতে না পারলেও বিভিন্ন উপায়ে আমরা একজন আরেকজনের পাশে থাকতে পারি। শুধু নিজে বাঁচবো ও নিরাপদ থাকবো - এ ধরণের সংকীর্ণ চিন্তাধারা বাদ দিয়ে সকলকে নিয়েই নিরাপদে থাকবো এই বোধটাকে দৃঢ় করতে হবে। আর তা করতে হলে নিজেদের খাদ্য, অর্থসম্পদ, সময় প্রভৃতি সহভাগিতা ও সহযোগিতা করা আবশ্যক। লকডাউনের এই বিশেষ সময়ে আমাদেরকে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর সাথে সাথে নিজের আমিকে চিনে নিতে চেষ্টা করি। ভবিষ্যতের উপযোগী সৃজনশীল ও নতুন নতুন কিছু কাজ শেখার প্রচেষ্টা চালাই। লকডাউনের সময়টাতে আমরা যেন 'লক' হয়ে না থাকি কিন্তু ঘরে থেকেই শৃঙ্খলা ও সম্পর্কে আরো বলীয়ান হই এবং যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম যথার্থভাবে ব্যবহার করে অনেক ভালো কিছু আমাদের জীবনে প্রবেশ (ইন) করাই। এ বছরের লকডাউন দেশের জন্য কার্যকরী ফল আনুক আর ব্যক্তি জীবনে নতুনত্ব নিয়ে আসুক॥ †

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যিশু তাদের বললেন, 'নবী কেবল নিজের দেশে, নিজের আপনজন ও পরিবার-পরিজনদের মধ্যেই অসম্মানিত ! (মার্ক ৬:৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

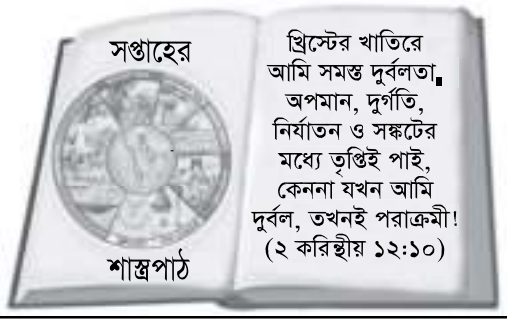

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৪ - ১০ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৪ জুলাই, রবিবার
এজিকেল ২: ২-৫, সাম ১২৩: ১-৪, ২ করি ১২: ৭-১০, মার্ক ৬: ১-৬

৫ জুলাই, সোমবার
আদি ২৮: ১০-২২ক, সাম ৯১: ১-৪খ, ১৪-১৫, মথি ৯: ১৮-২৬

৬ জুলাই, মঙ্গলবার
সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি, কুমারী ও ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
আদি ৩২: ২৩-৩৩, সাম ১৭: ১-৩খ, ৬-৮খ, ১৫, মথি ৯: ৩২-৩৮
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ করি ৬: ১৩গ-১৫ক, ১৭-২০, সাম ৩১: ১কখ, ২গঘ, ৫, ৬খ, ৭ক, ১৬, ২০কখ, মথি ১০: ২৬ক, ২৮-৩৩

৭ জুলাই, বুধবার
৪১: ৫৫-৫৭, ৪২: ১-৭ক, ১৭-২৪ক, সাম ৩৩: ২-৩, ১০-১১, ১৮-১৯, মথি ১০: ১-৭

৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার
আদি ৪৪: ১৮-২১, ২৩খ-২৯, ৪৫: ১-৫, সাম ১০৫: ১৬-২১, মথি ১০: ৭-১৫

৯ জুলাই, শুক্রবার
আদি ৪৬: ১-৭, ২৮-৩০, সাম ৩৭: ৩-৪, ১৮-১৯, ২৭-২৮, ৩৯-৪০, মথি ১০: ১৬-২৩

১০ জুলাই, শনিবার
আদি ৪৯: ২৯-৩২; ৫০: ১৫-২৪, সাম ১০৫: ১-৪, ৬-৭, মথি ১০: ২৪-৩৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৪ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৯৭ ফাদার ইতালো গাউদেঞ্জি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ ফাদার রিনাল্ডো নাভা এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ ব্রাদার আন্তনী কেভিন টুডু টিওআর (দিনাজপুর)

৬ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ২০১৭ সিস্টার রোজ বার্নার্ড সিএসসি (ঢাকা)

৭ জুলাই, বুধবার
+ ১৯৫৮ সিস্টার এম. আগাথা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী সেলিন এসএমআরএ

৯ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৫১ ফাদার অত্তোরিনো পেদ্রোত্তি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৩ সিস্টার জন লাপ্রোয়াত সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১০ জুলাই, শনিবার
+ ১৯১৭ ফাদার এডুয়ার্ডো ফেরারিও পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭০ ফাদার মারিও কিওফী এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বেনেডিক্টস্ পিসিপিএ (দিনাজপুর)

একটি ভাবনা

চারিদিকেই আতঙ্ক, করোনাভাইরাসের আতঙ্ক, আতঙ্কে আতঙ্কেই পার হয়ে গেল ২০২০ খ্রিস্টবর্ষটি, পার হতে চলল ২০২১ খ্রিস্টাব্দও। অল্প বয়স্ক, মধ্য বয়স্ক, চেনা-অচেনা বহু লোক মারা গেলো। দেশে-বিদেশে চারিদিকেই মৃত্যুর সংবাদ, মৃত্যুর ভয়। তাই বলে মৃত্যুভয়ে মানুষ ঘরে বসে থাকেনি, রোজগারের তাগিদে, বাঁচার তাগিদে ঘর থেকে বের হতে হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে অদৃশ্য শত্রু করোনাভাইরাসে। করোনাভাইরাস আতঙ্ক নিয়ে মৃত্যু মিছিলের মাঝ দিয়ে অনেকটা পথ চলে এসেছি। আতঙ্কের মাঝে এখনও বেঁচে আছি, এ তো ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ। ঈশ্বর কি চায়, আমাদের কি দায়িত্ব, এসব উপলব্ধি করে তা পূরণ করাই হবে বাস্তব সম্মত জীবন-যাপন। সাধু পলের কথায়, আমরা বাঁচি বা মরি প্রভুর জন্য বাঁচি, আবার প্রভুরই জন্যই মরি। প্রতিদিনই বাসে বা উবার করে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করছি, দূরত্ব বজায় রেখে, মাস্ক পরে সকলের সাথে কথা বলছি, মেলামেশা করছি, এখনও পর্যন্ত ভাইরাস আতঙ্ক নিয়েই এগিয়ে চলছি। করোনাভাইরাসের মতো আমরা আরও একটি অদৃশ্য ভাইরাসে ডুবে রয়েছি, সেটার জন্য আমারা মোটেও আতঙ্কিত নই, বিচলিত নই ও দুঃখিতও নই। আর সেই ভাইরাসটি হল 'পাপ'। এই দুইটি ভাইরাসই ওত পেতে আছে আমাদেরকে গ্রাস করবে বলে। তাই এই দুইয়ের বিপক্ষেই আমাদের অধিকতর সচেতনতা আবশ্যক। হতে ও তো পারে করোনাভাইরাস আমাদের পাপের শাস্তি। পাপে পরিপূর্ণ বর্তমান বিশ্ব। স্মরণ করতে পারি বাইবেলে পুরাতন নিয়মে বর্ণিত মিসরের রাজা ফারৌণ ১০টি আঘাত পাওয়ার পর মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়দের ছেড়ে দিয়েছিল। তাই ভাবছি সমগ্র মানবজাতি করোনাভাইরাসের মত কতটি আঘাত পেলে মানবজাতি পাপের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসবে? দশগুন দশটি কি?

আমাদের জীবনে আমরা অনেকেই তো ভাল কিছুই করতে পারিনি, ভাল কিছু হতেও পারিনি। আমার জীবনটা তো এইরূপই। জীবনের শেষ ধাপে এসে ভাবছি, আর পাপ না করে ভাল কিছু করবো বা ভাল কিছু হবো।

বেঞ্জামিন গমেজ
আমেরিকা

বিশেষ ঘোষণা

সরকার ঘোষিত কঠোর লকডাউন (১-১৪ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ) -এর কারণে 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' বন্ধ থাকবে। তবে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিসসহ মিডিয়া কার্যক্রম বিশেষ ব্যবস্থাপনায় চলমান থাকবে। 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরবর্তী সংখ্যাগুলো অনলাইনে যথাসময়ে পাওয়া যাবে। পরিবেশ স্বাভাবিক হলে প্রিন্ট আকারে তা প্রকাশিত হবে।

পরিচালক ও সম্পাদক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

যিশু হৃদয়ের উপচে-পড়া ভালবাসা

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

একদিন এক গির্জায় খ্রিস্টযাগে দান সংগ্রহের সময় একটি মজার ঘটনা ঘটলো। প্রভুর বেদীতে নৈবেদ্য উৎসর্গের সময় ভক্তদের কাছ থেকে দান সংগ্রহের উদ্দেশে দান-সংগ্রহকারী ব্যক্তিটি এগিয়ে আসছেন। এর একটু পেছনে একজন লোক তার পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিয়ে কী জানি বার বার খুঁজছেন। দেখা গেল, তার পকেটে অনেকগুলো পঞ্চাশ টাকার নোট। দান-সংগ্রহকারী যখন এগিয়ে এলেন, তিনি তখন তা পেয়ে গেলেন, যা তিনি এতক্ষণ ধরে খুঁজছিলেন - পাঁচটি টাকা । আর তা-ই তিনি নৈবেদ্যরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে দান করলেন।

কারো-কারো অনেক আছে, কিন্তু দান করে কম। কেননা অনেক মানুষের মাঝে একটা প্রবৃত্তি আছে: "যে যত পায়, সে তত চায়।" মহান দাতা ঈশ্বরকে দান করতে আমাদের কারো-কারো অনেক কষ্ট হয় - ঠিক যেমন কষ্ট হয় গরীব-দুঃখীকে কিছু দান করতে। যিশু আমাদের আদেশ দিয়েছেন সীমাহীনভাবে দান করতে: "তোমরা দান করো, তাহলে তোমাদেরও দান করা হবে: পুরো মাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া মাপেই তোমাদের কেরা ঢেলে দেওয়া হবে।" *(লুক ৬:০৮)*

আমাদের নিজেকে আমাদের জন্যে দান করেছেন; যখন আমরা এরূপ দান পাবার মোটেই উপযুক্ত নই, তখন তিনি নিজেই উপযাজক হয়ে নিজেকে দান কররেন। আর তাই যিশু নিজেই আমাদেরকে তাঁর এবং স্বর্গীয় পিতার মত উপচে-পড়া ভালবাসা দিয়ে দান করতে বলেন: "তোমরা দান কর, তাহলে তোমাদেরকে দান করা হবে: পুরো মাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া মাপেই তোমাদেরকে ঢেলে দেওয়া হবে।"*(লুক ৬:৩৮)*

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মেও পিতা ঈশ্বরের এই উপচে-পড়া ভালবাসার কথা বলা হয়েছে, যা প্রবক্তা যিহিষ্কেলের কণ্ঠে স্পষ্টরূপে ধ্বনিত হয়েছে: "যদি কোন দুষ্ট লোক তার সব পাপ থেকে ফিরে আমার নিয়ম-কানুন পালন করে আর ন্যায় ও ঠিক কাজ করে তবে সে নিশ্চয়ই বাঁচবে, মরবে না। সে যেসব অন্যায় করেছে তা আমি আর মনে রাখব না"। *(যিহিয়েল ২৮:২১-২২)*

কেননা, ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে তাঁর হৃদয়ের গভীর ভালবাসা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজ 'প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য' করে সৃষ্টি করেছেন। *(আদিপুস্তক ১:২৬)*

তাই তিনি পাপীকে তার পাপ-অপরাধের জন্যে প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে কোন আনন্দ পান না, বরং পাপী তার পাপের পথ থেকে মন ফেরালে তিনি প্রচুর আনন্দ পান: "পাপীর মৃত্যুতে আমি কোন আনন্দ পাই না, বরং তারা যেন কুপথ থেকে ফিরে বাঁচে, তাতেই আমি আনন্দ পাই"। *(যিহিয়েল ৩৩:১১)*

যিশু হৃদয়ের ভালবাসার মধ্যেও পিতার হৃদয়ের মত এই উপচে-পড়া গভীর ভালবাসার চিত্রটি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে যিশুর কথায় ও কাজে: "আমি তো ধার্মিকদের নয়, বরং পাপীদেরই উদ্ধার করতে এসেছি।" *(মথি ৯:১৩)*

তাছাড়া তাঁর শিক্ষায় যিশু তাঁর হৃদয়ের এই উপচে-পড়া ভালবাসার কথা গল্পের আকারে তুলে ধরেছেন, যেন মানুষ সহজেই তাঁর হৃদয়ের গভীর ভালবাসার স্পর্শ পেতে পারে - ঠিক যেমন পেয়েছিল পাপী নারী মারীয়া মাগদালেনা, পাপী সমরীয় নারী, করগ্রাহক মথি, মৃত্যুর পথযাত্রী অনুতাপী দস্যু এবং আরো অনেকে। মঙ্গলসমাচার লেখক সাধু যোহন তাই পিতা-পুত্র ঈশ্বরের এই ভালবাসার গভীরতা তুলে ধরেন এভাবে: "ঈশ্বর জগতকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের কারো-ও যেন বিনাশ না হয়, বরং তারা সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন।"*(যোহন ৩:১৬)*

দুর্বল পাপী মানুষের জন্যে যিশুর হৃদয়ের এই উপচে-পড়া মহা ভালবাসা উপলব্ধি করে সাধু পল তাই বলেন: "তোমরা তো এক সময়ে নিজেদের পাপ ও অপরাধের ফলে মৃতই ছিলে; ---কিন্তু করুণানিধান ঈশ্বর এমনই গভীর প্রেমে আমাদের ভালবেসেছেন যে, আমরা যখন আমাদের অপরাধ-অপকর্মের ফলে মৃত ছিলাম, তিনি তখন খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদেরও সঞ্জীবিত করে তুললেন। হ্যাঁ, ঐশ অনুগ্রহেই পরিত্রাণ পেয়েছো তোমরা! --- এ পরিত্রাণ তোমাদের কাজ নয়, ঈশ্বরেরই দান।" *(এফেসীয় ২:১, ৪-৫)*

যিশু তাঁর প্রত্যেক অনুসারীকে আদেশ দিচ্ছেন যেন, তারাও তাঁর মত করে অন্যকে হৃদয়-উৎসারিত উপচে-পড়া ভালবাসা দান করে। শুধু ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা দান নয়, বরং যারা আমাদের ভালবাসে না, এমন কি, শত্রুর মত আচরণ করে, আমরা যেন তাদেরকেও আমাদের হৃদয়ের উপচে-পড়া ভালবাসা দান করি। তাই যিশু তাঁর অনুসারীদের আদেশ দেন: "আমি তোমাদের বলছি: তোমরা তোমদের শত্রুকে ভালবাসো; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো।" *(মথি ৬:৪৪)*

যিশু আমাদেরকে হৃদয়ের ভালবাসার এমন এক গভীর স্তরে প্রবেশ করতে আদেশ দেন, যা জগতের মূল্যবোধ ও প্রচলিত রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু তা সত্যিই অপূর্ব ও গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ, কেননা তা স্বর্গীয়, মহা মূল্যবান - ঠিক পিতা ঈশরের ভালবাসার মতন, যিনি পাপী-ধার্মিক-অধার্মিক, ভাল-মন্দ সবাইকে অনেক ভালবাসেন, কেননা সবাই যে তাঁর সন্তান *(দ্র: মথি ৬:৪৫)*।

মোশীর ভালবাসা ছিল 'ন্যায্য ভালবাসা' ('Just love') নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর 'ন্যায্য ভালবাসা'র শ্রেষ্ঠ উদাহরণ: "চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত।"[১০] কিন্তু যিশু দেখিয়েছেন যে, এই ন্যায্য ভালবাসা মানুষকে প্রকৃত মুক্তি বা পরিত্রাণ দান করতে পারে না; বরং তা পূর্ণ মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের পথে বাধাস্বরূপ - কেননা, ন্যায্যতা দিয়ে অন্যকে দমন করা যায়, ন্যায্য বিচার-আচার দিয়ে অন্যকে শাস্তি দেওয়া যায় বটে, কিন্তু কখনোই অন্যের, বিশেষভাবে, শত্রুর হৃদয় জয় করা যায় না। তাই টুইন টাওয়ার আক্রমণের পর প্রেসিডেন্ট বুশ প্রতিশোধ ও শাস্তি হিসাবে শত্রুকে আক্রমণের যুক্তি হিসাবে বলেছিলেন: "মন্দের বদলে মন্দ" ("Evil for

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপাসনায় পরিচালকের-যাজকের যথার্থ আচরণ

ফাদার সুশীল লুইস

লেখার পটভূমি ও শুরুর কথা : বর্তমানে করোনাভাইরাসের যুগে সর্বত্র, সকলকে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপনের জন্য বার বার অনেক সতর্ক বার্তা দেয়া হচ্ছে, নানা পদ্ধতি, উপকরণ প্রস্তাব করা হচ্ছে। অনেকে সচেতন, দায়িত্বশীল তাই অন্যকে নানা পরামর্শ ও স্বাস্থ্য বিধি দিচ্ছেন। আমি মনে করি একইরূপ নির্দেশ বা কোন কোন ক্ষেত্রে বিধি প্রযোজ্য হতে পারে সমবেত উপাসনায়ও। কেননা হতে পারে আমরা করোনাভাইরাস থেকে কিছুটা দূরে থাকব, কিন্তু আমাদের অন্য জটিলতার পথও প্রশস্ত হতে পারে, সেখানে পরস্পরের ক্রিয়া ও আচরণের কারণে। বিশেষভাবে উপাসনার সময়ে বা উপাসনা থেকে। যাজক বা এরূপ কোন পরিচালক যেহেতু সবার মধ্যে, জন্য ও সাথে প্রকাশ্য ধর্মীয় ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাই সবার নিরাপদ জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় তার তো এ বিষয়টি প্রথমে দেখা ও বিবেচনা করা দরকার। এখানে কোন ছোট-বড়, জাতি, শ্রেণী, পাপী-তাপী, ধনী-গরিবের পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পুণ্য উপাসনার সংবিধান অনুসারে উপাসনা যেহেতু: "সর্বসাধারণ ও সমাজগত স্বভাবের অধিকারী", উপাসনায় অনেকে থাকেন। এখান থেকেই তাই আমার লেখার মূল বিষয় শুরু: যাজকগণ পাশাপাশি অন্য পরিচালকগণ কীভাবে উপাসনা পরিচালনা করেন বা করবেন সেসব স্বাস্থ্যসম্মত ও সুন্দর কিনা। নিজের অভিজ্ঞতা, দেখা, চিন্তা ও পড়ার ভিত্তিতে এ লেখাটি। প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিষয়গুলিও আসছে। যেমন উপাসনায়/ধর্মকর্মে ভক্তরা নিজেরাও সেই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শালীনতা, সৌন্দর্য, প্রভৃতি দেখতে ও দেখাতে চান। তাদের সেক্ষেত্রে দায়িত্ব ও সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। তাই সেভাবে ধারাবাহিকভাবে এ লেখায় অগ্রসর হচ্ছি। সংস্কারগুলির মধ্যে খ্রিস্টযাগ হল সর্বপ্রধান, যার মধ্যে খ্রিস্ট তাঁর চরম ভালবাসা নিয়ে নিজে উপস্থিত থাকেন ক্রিয়া ও ব্যক্তির মধ্যে। যাজক উপাসনায় সভাপতি, দৃশ্যভাবে কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। এভাবে আরো অনেক উপাসনায় অন্য ব্যক্তি হতে পারে। তাই যাজককে বা অন্য পরিচালক ঘিরে উপাসনায় কিছু বিবেচ্য বিষয়:

স্বাস্থ্য রক্ষা, সৌন্দর্য-ভক্তি, ভালবাসা-পবিত্রতা: ভক্তজনগণ ও যাজকবর্গ (পরিচালকবর্গ ও যারা সামনে প্রকাশ্যে কিছু করেন) একক ও দলীয়ভাবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে, অন্তরের ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তি-ভালবাসা, সৌন্দর্য-পবিত্রতা প্রভৃতি নিয়ে প্রতিদিনের ধর্মকর্ম, উপাসনা, খ্রিস্টযাগসহ অন্যান্য সংস্কার, উদ্‌যাপন করতে ডাক পান। অন্যদিকে ভক্তবৃন্দ উপাসনায় যাজকের মধ্যে বরাবর এসব দেখতে অনেক প্রত্যাশা করেন ও ভালবাসেন। আজকের যুগ হল নড়াচড়া, ব্যস্ততা, ভোগবাগ, আরাম, কথা ও শব্দের যুগ; সে কারণেও ভক্তগণ উপাসনায় উপরোক্ত বিষয়গুলি পছন্দ করেন। আমরা জানি উপাসনা হল আশা ও প্রশান্তির ক্রিয়া, মুক্তি ও ভালবাসার উদ্‌যাপন, পবিত্র জনগণের উৎসব অনুষ্ঠান, ভক্তমণ্ডলীর মিলন-উৎসব, অশোভনীয় কিছু কি সেখানে গ্রহণযোগ্য হবে? অবশ্যই নয়! যাজক/পরিচালক তার আচরণে উপরে উক্ত দিকগুলি ফুটিয়ে তুলে তার অন্তরের ভাব প্রকাশ করেন-আর সেসব অন্যদের গভীরভাবে স্পর্শ ও প্রভাবিত করে। সুস্বাস্থ্য, ভক্তি-সৌন্দর্য পবিত্রতা, ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তিভাব, প্রভৃতি ঈশ্বরের মহা দান! খ্রিস্টযাগে সংস্কারে যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান উদ্‌যাপন করা হয় যা নাকি খ্রিস্ট বিশ্বাসের ভিত্তি। এই উৎসবের মাধ্যমে প্রত্যেকে সানন্দে অন্যের সঙ্গে, অন্যের পাশে উপাসনায় অংশ নেন। পুণ্য উপাসনায় যেন সর্বদা সৌন্দর্য, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নীরবতা, পবিত্রতা, প্রশান্তি, আরাধনার ভাব প্রভৃতি বিরাজ করে। আর ভক্তবৃন্দ যেন সেখানে গভীর ভরসায়, প্রশান্তিতে জীবনময় নৈবেদ্যরূপে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন এবং উপাসনা থেকে অনেক ফল লাভ করতে পারেন। উপাসনার পুণ্য ক্রিয়ায় উপাসনা পরিচালনাকারীদের কাজ এবং ভক্তদের অংশগ্রহণ দ্বারা উপাসনার সামগ্রিক একাত্মতা ও ভক্তিভাব যেন থাকে। আর এসবগুলিকেই আমি বাস্তবতা অনুসারে ছোটবড় অস্বাস্থ্যকর, অশোভনীয়, বিঘ্নজনক, ভক্তিহর আচরণ হিসাবে চিহ্নিত করছি। এ বিষয়গুলি সকলকে সচেতন থাকতে হবে এবং সবার চেষ্টা ও কাজে সেসব থেকে দূরে থাকতে হবে।

উপাসনা ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে সফল হতে বহুবিধ অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, ধর্মজ্ঞান, গঠন, জ্ঞান-দক্ষতা, অনুশীলন, নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ, অন্তরের উদারতা, অনেক ইচ্ছা, আগ্রহ, পুরোহিতসহ ভক্তজনগণের একতা, সুসম্পর্ক, সৃজনশীলতা, সচেতনতা, ভাল পরিকল্পনা, দায়িত্ববণ্টন, সাধনা প্রভৃতি অনেক প্রয়োজন। সেজন্যে পরের বিষয়গুলি সযতনভাবে খেয়াল রাখা উচিৎ।

১- উপাসনায় স্বাস্থ্যসম্মত বা স্বাস্থ্যবান্ধব আচরণ:

আমরা সযতনে, সমবেতভাবে পবিত্র উপাসনায় অংশগ্রহণ করি, তারপরও বাহ্যিক অপরিচ্ছন্নতা, অস্বাস্থ্যকর কিছু আমাদের উপাসনায় ঝুঁকি ও বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে নিজের ও অন্যদের। খ্রিস্টযাগে স্বাস্থ্য বিষয়ক কিছু বাস্তবতা, পর্যবেক্ষণ ও সেসব ঘিরে নিচে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হল, তবে আরো বহু থাকতে পারে :

-অনেকবার পোশাকে, চেহারায়, সাজগোজ, কথা, গান, প্রার্থনা, পরিবেশ প্রভৃতিতে পূর্ব প্রস্তুতি ও একাগ্রতা কম থাকে। হতে পারে কেউ কেউ কর্মস্থান থেকে সরাসরি ধর্মস্থানে চলে যান, সেখানে প্রস্তুতি, পরিচ্ছন্নতা, পোশাক, মনোযোগ প্রভৃতির বিষয় থাকে। সকালের খ্রিস্টযাগে অনেকবার উপযুক্ত প্রস্তুতি ও পরিচ্ছন্নতার বিষয় থাকে। অপরিচ্ছন্নভাবে উপাসনা করা হলে সেটা সবসময় স্বাস্থ্যকর নাও হতে পারে। বিষয়গুলি দৃষ্টিকটু, কিছুটা ঘৃণ্য, বলতেও তত ভাল লাগে না, কিন্তু এসব অনেকবার বাস্তব ও দৃশ্যমান হয়।

-উপাসনায় হাতের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাঝে মাঝে ময়লা হাত, প্রকাশ্যে হাত দিয়ে শরীর চুলকানো, যথাতথা হাত ব্যবহার, কোন অঙ্গের নড়-চড়া, ঘর্ষণ ইত্যাদি মানুষের নজরে আসে। ধর্মকর্মের সময় বিশেষতঃ উৎসর্গ অংশে প্রকাশ্যে হাত দিয়ে শরীরের কোন অঙ্গের অতিরিক্ত নড়চড়া, শব্দ, প্রভৃতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর নয়। হাত না ধুয়ে নেয়া, ময়লা হাতে উপাসনা করা এসব মানুষের অপছন্দের। উপাসনায় সবার সামনে হাতের এরূপ ব্যবহার হিন্দুধর্মে সেবার অপরাধ হিসাবে দেখা হয়।

-উপাসনায় কখনও কখনও বাম হাত আগে ব্যবহার বা বেশী ব্যবহার ও নড়াচড়া না করা, মানুষের প্রত্যাশার। আরো একটু অগ্রসর হলে বলা যেতে পারে, উপাসনায় বাম হাত আগে বা বেশী ব্যবহার ও নড়াচড়া করা মানুষের বেশি পছন্দের নয়, বরং বিঘ্নজনক। এটি মানুষের সাংস্কৃতিক ও মনোগত ব্যাপার তারপরও তা উপাসনায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এরূপ কিছু হলে ভক্তদের মধ্যে নানা অসন্তুষ্টির, বিরক্তির আলাপ হয়। এসব উপাসনার পরিবেশ ও মনোযোগ নষ্ট করে, উপাসনার সেবার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপাসনা ঘিরে আরো কিছু উদাহরণ দে'য়া যেতে পারে। যেমন: অপরিচ্ছন্নতা, ময়লা শরীর-মুখ, অপরিপাটি চুল-মাথা (চুল পড়ে, ওড়ে) অপরিস্কার কাপড়, কারো কারো নোংরা রুমাল ব্যবহার প্রভৃতি উপাসনায় স্বাস্থ্যবান্ধব ও শোভন হবে না।

উপাসনায় অনেক বেশি কথা, জোরে কথ নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সেখানে বিপদের ঝুঁকি আছে বা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সতর্কতা প্রয়োজন।

-অন্যদিকে উপাসনা চলাকালে জোরে হাঁচি-কাশি (রুমাল ব্যবহার করা ভাল), গলা ও মুখের শব্দ অস্বাস্থ্যকর। হাঁচি-কাশি, প্রভৃতি অন্য যাজকের কাছে, ভক্তদের জন্য দৃষ্টিকটু, শ্রুতিকটু, অসুন্দর, অপছন্দের, উপাসনায় অংশগ্রহণকারীগণ এসব ঘৃণা করেন। হাঁচি-কাশির সময় মুখে হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে হাত দিয়ে উপাসনার কোন সামগ্রী সরাসরি ধরা বা পরে সে হাতেই পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ করা অসুন্দর লাগে, রুচিতে বাঁধে, সেভাবে অস্বাস্থ্যকর কিছু হতে পারে। এসব কিন্তু অনেকবার দেখা যায়। আর উপরের বিষয়গুলি অন্য যাজকের জন্য বা উপস্থিত ভক্তদের জন্য ক্ষতিকারক, ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ কারো কোন অসুস্থতা থাকলে তার জীবাণু সহজে অন্যের মধ্যে যেতে বা ছড়াতে পারে। আমরা জানি রোগ হাঁচি, কাশি, থুতু, কোন জিনিস, একই জিনিস ব্যবহার, স্পর্শ, কাছে অবস্থান প্রভৃতির মাধ্যমে ছড়াতে পারে। অনেকে থাকে থুতু দিয়ে বই ধরেন বা উল্টান সেটিও তত সুন্দর লাগে না। একই জিনিস অনেকে ধরেন। নখ বড় থাকা, ময়লা থাকা এসবও স্বাস্থ্যপ্রদ নয়।

খ্রিস্টপ্রসাদের পরে পান পাত্রের রুমাল (মার্জনী) দিয়ে নিজের মুখ মোছা, সেটি দিয়ে আবার পান পাত্র মোছা, মুখ হা করে পান পাত্রে ঢুকিয়ে প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা বলা, মুখ অনেক বেশি খুলে প্রার্থনা ও কোন কথা বলা, পানির পাত্র ভিতরে ঢুকিয়ে জল বা দ্রাক্ষারস ঢালা শোভন নয়, কারণ সেভাবে অনেক বার ভিতরে থুতু ও ময়লা কিছু পড়তে পারে।

-অনেকে আছে আবার শুধু যিশুর রক্ত পান করে রেখে দেয় মুছেন না অন্য জনকে জল দিয়ে মুছতে হয় সেটাও এ ক্ষেত্রে ভাল নয়। কেউ-কেউ এক পাত্র থেকে পান করে কিন্তু রুমাল ব্যবহার করে না, মুছে না। বড় অনুষ্ঠানে বা অনেক পুরোহিত একত্রে থাকলে এক পাত্রে পান করলে অনেকে ভালভাবে পাত্র মুছেন না, কেউ কেউ আবার শালীনভাবে পান করতেও অভ্যস্ত নন, শিশুদের মত পান করেন। পরে হতে পারে একই জিনিস উপকরণ, পাত্র অন্য জন ব্যবহার করেন। কেউ কেউ আবার শব্দ করে পান করেন। এসব বিষয় স্বাস্থ্যের জন্য তত সুখকর নয়।

অনেকে মুখে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করেন-সেটাও অনেকবার গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। যাজকের নিজে কোন অসুস্থ্যতা থাকলে তাকেও সেভাবে সচেতন ও সাবধান হয়ে উপাসনা পরিচালনা করতে হবে মানুষের নিরাপত্তার জন্য।

উপাসনায় এসব ক্ষেত্রে অন্য কিছু দিকও আসতে পারে। যেমন পানপাত্রও অনেক সময় ভাল পরিস্কার থাকে না। সেখানে বিভিন্ন কিছুর দাগ বা ময়লা থাকতে পারে। বার বার পাত্রের কানিতে ধরা সেভাবে রেখে দেয়া, পরিস্কার করা হয় না। তাছাড়া পানপাত্রে অনেক কিছু পড়তে পারে তাই সযত্নে সেই পাত্র ঢেকে রাখা ভাল। তা ছাড়াও সেই পাত্রে আগে-পরে নানা ধরনের পোকা, পিঁপড়া, মাছি পড়তে পারে, ময়লা আসতে, থাকতে পারে যা স্বাস্থ্যের জন্য কোনভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে সেজন্য আগে থেকে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ঘর, গির্জা উপকরণ তত পরিস্কার, রুচিশীল ও সুন্দর নয়। সেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকে না। এসবও তত স্বাস্থ্যকর ও ব্যবহার উপযোগী নয়। এসব ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ ও তৎপরতা প্রয়োজন। অন্যদিকে বাস্তবতা অনুসারে সেখানে টয়লেট ও জলেরও সুব্যবস্থা রাখা দরকার।

শরীর মন ভাল থাকলে সব ভাল থাকে। সেখানে আনন্দ থাকে। অনেক সাধনা করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করে পৃথিবীতে চলতে হয়। আরবী প্রবাদে বলে: "যার স্বাস্থ্য আছে তার আশা আছে; আর যার আশা আছে তার সব কিছুই আছে।" স্বাস্থ্যকর কোন কিছু করা হল সুখকর, তাতেই স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। স্বাস্থ্য হল মানুষের বড় সম্পদ, সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে আত্মা যেন ভাল পরিবেশে, ভাল ঘরে থাকে। মানুষ নিজের চেষ্টায় ও উদ্যমে নিজেকে স্বাস্থ্যময় ও প্রফুল্ল রাখতে পারে। নির্মল মন থাকলে স্বাস্থ্যকরভাবে সব করা যায়। অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হয়। স্বাস্থ্যকর উপাসনা করে সুস্থ্য মন লাভ করা যায়। "সর্বপ্রথম ধনই স্বাস্থ্য" বলেছেন ইমারসন।

সেখানে সবাই পরম সুস্থিরতায়, সমতায়, শান্তিতে, শর্তহীন ভরসায়, সন্তানসুলভ আত্মনিবেদনে অংশ নেবার কথা। সেখানে কষ্টদায়ক, বিঘ্নজনক, অস্বাস্থ্যকর কোন কিছু থাকার কথা নয়। তারপরও কোন কারণে যদি কোন কিছু এসে থাকে এবং উপাসনা ব্যাহত করে তা অবশ্যই সবার চেষ্টা ও কাজে দ্রুততম সময়ে দূর করা অত্যাবশ্যক। এসব ছোট ছোট বিষয়ে; সংশ্লিষ্টদের সচেতন, সতর্ক থাকতে হবে; এগুলি বিবেচনায় আনতে হবে এবং এসব থেকে প্রথমে নিজেরা দূরে থাকতে হবে তারপর অন্যদেরও দূরে রাখতে হবে। উপাসনায় যে কোন পরিচালককে সর্বদা সচেতন, তৎপর ও দূরদর্শী হতে হবে। উপাসনা ক্ষেত্রে তাই সেসব না করা, বর্জন করা পরিচালকদের দায়িত্বও। উপাসনায় স্বাস্থ্যকরভাবে সব কিছু করা হলে সবার কাছে সেগুলি আনন্দের ও গ্রহণযোগ্য হবে। স্বাস্থ্যকর কাজ করলে অর্থপূর্ণ উপাসনা করা সম্ভব হবে আর অন্যদিকে রোগ মানুষের কাছে আসতে সহজে সুযোগ পাবে না।

২- উপাসনায় অশোভন/অশালীন আচরণ :

সুন্দর স্রষ্টা মানুষকে নিজের রূপে অনেক সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন আর কতরূপে যে সে সৌন্দর্য প্রকাশ করে যাচ্ছেন! মানুষ সুন্দরের পূজারী। সৌন্দর্য মানুষের অন্তরের পরিপূর্ণতা আনে। টমাস ফুলার বলেছেন: "আত্মার সৌন্দর্য মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে।" "ভদ্রতা হল ব্যবহারের সৌন্দর্য" বলেন রবি ঠাকুর। সেদিক থেকে মানুষের আচরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। যা মানুষকে অন্যের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে মিলতে সাহায্য করে তা সুন্দরের দান। "সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের সৌন্দর্য হল আত্মার সৌন্দর্য, যেভাবে তা মানুষের মুখের ভাবে প্রকাশিত হয়। চোখের আনন্দ দ্বারা, ঠোঁটের হাসি দ্বারা- এসব ভিতরের সুখ ও তৃপ্তি ইংগিত করে। এটা হল সম্ভবত সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য যা আমরা কখনো দেখব" বলেন উইলিয়াম রস।

যা শোভন তা আমরা পছন্দ করি, ভালবাসি, তাতে আমরা আনন্দ পাই। "সুন্দর জিনিষ চিরকালের আনন্দ" বলেন জন কিটস। সৌন্দর্য-ভক্তিতে স্রষ্টাকে বরণ করি, প্রতিদিনের জীবন সুন্দর করি। যদিও কথায় বলে: "সুন্দরের জয় সর্বত্র"।

এ জগতে মানুষের মহত্তম উদ্দেশ্য হল, সত্য, সুন্দর, মহৎ স্রষ্টা প্রভুকে স্বতন্ত্র ভক্তি-পূজা করা ও সর্বত্র তার উপস্থিতি উপলব্ধি করা। "Beauty is a reflection of Christ's presence in the world." উপাসনায় মানুষের মন তার কাছে উত্তোলন করেন, তাঁকে প্রণাম করেন। বাইবেলে বলা হয়, "যা- কিছু সত্য, যা-কিছু শ্রদ্ধার যোগ্য, যা কিছু ধর্মসঙ্গত, যা-কিছু পূণ্য পবিত্র, যা-কিছু ভালবাসার যোগ্য, যা-কিছু শোভন সুন্দর-যার মধ্যে কিছু সদ্গুণ আছে, প্রশংসা করার মতো কিছু আছে, তাই হোক তোমাদের ধ্যানজ্ঞান" *(ফিলিপ্পীয় ৪: ৮)*! সেসবই ভক্তদের কাছে পরম সম্পদশালী, কেন না সেই সব-কিছু স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে ।

"সৌন্দর্য মানুষের অন্তরের পরিপূর্ণতা আনে" বলেন শিলার। "সুন্দর পোশাক পরিহিত ব্যক্তি মাত্রই ভদ্রলোক নয়" বলেন জন রে। ব্যবহারে হল তার আসল পরিচয়। যেভাবে ফলে গাছের পরিচয়। মানুষের বিশ্বাসপূর্ণ অন্তর থেকেই সৌন্দর্য-প্রেম প্রকাশিত হয়। তা না হলে উপাসনা হবে বিচ্ছিন্ন খন্ড খন্ড বাহ্যিক অনুষ্ঠান যার সঙ্গে অন্তরের বেশি যোগ থাকবে না। উপাসনায় অন্তরের যত বেশি যোগ থাকবে ধাপে ধাপে তা তত সমন্বিত হতে পারে। তা যত সুন্দর হবে তা ততই ফলপ্রসূ হতে পারে। উপাসনার বেলাতেও ভক্তগণ পরিচালকদের শোভন, মার্জিত আচরণ পছন্দ করেন। তা তাদের ভালবাসার গভীরতায় চালনা করতে পারে। বার বার মনে রাখতে হয় যে, ঈশ্বরকে ঘিরেই ভক্তদের আনন্দ-সৌন্দর্য। আমি উপাসনার কিছু বাস্তব বিষয় উল্লেখ করছি আমার লেখার কারণে, তবে বাস্তবে আরো অনেক বিষয় থাকতে পারে এবং আছে।**(চলবে)**

বাবা আমার-মা আমার

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা : পরিবার গঠন সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি স্বীকৃত বিষয়। ঈশ্বর সৃষ্টি লগ্ন হতে আদম-হবাকে আকাশের তারকা ও ধুলিকনার মত বংশ বৃদ্ধির আশীর্বাদের যাত্রা শুরু করেন। যিশু খ্রিস্ট জগতে এসে পিতা-মাতা, তাদের সন্তান সম্বন্ধে আলাদা ভাবে অনেক উপদেশ, নির্দেশ এবং ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। পরিবারে সন্তান প্রাপ্তি প্রভুর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ। পিতামাতা হওয়ার গৌরব অর্জনের মাধ্যমে তাদের উপর বর্তায় কয়েকটি মৌলিক দায়িত্ব-কর্তব্য। এ দায়িত্ব দুজনের মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে কম-বেশি নয়। উভয়ই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় দায়িত্ব পালনে প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। অতএব মা দিবসের মত বাবা দিবসে সন্তানদের উপলব্ধি হচ্ছে তারাই আমাদের পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন বিধায়, আলোর সন্তান হতে যা যা করণীয় সবই তাদের নৈতিক দায়িত্বের সামিল এবং খ্রিস্টীয় ভাবধারায় ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে সার্বিক নিরাপত্তা বিধান, গঠন প্রক্রিয়া এবং চিন্তা চেতনায় সর্বাগ্রে শিশু নিশ্চয়তা পাবে যে, আমার বাবা হওয়ার যোগ্যতা, আমার মধ্যে শতভাগ বিরাজ করছে।

আমার জন্য পিতৃত্ব লাভ : ঈশ্বরের আশীর্বাদের উত্তম ফসল পিতার সন্তান। শিশু সন্তানের মঙ্গল, কল্যাণে মায়ের প্রাথমিক ভূমিকা আরম্ভ হয়েছে সার্বিক পরিচর্যা, নিরাপত্তা, দৈহিক গঠন, আরাম-আয়েশ, আদর-সোহাগ, ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখা। বাবার দৈহিক গড়ন শিশুর প্রথম নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। বাবার শরীর, বাহু, হাত ইত্যাদির স্পর্শের মাধ্যমে শিশুর নিরাপত্তা শিশু জানে। কেননা বাবা তিনি তো শক্ত সমর্থ মানুষ, তাই শিশু অনুভব করে সব ধরণের নিরাপত্তা। যখন শিশু বাবার কোলে থাকে, তখন সে জানে যত বিপদই আসুক, তার কোন ক্ষতি হবে না কেননা বাবা তাকে রক্ষা করবেন। বাবা নিজের সর্ব শক্তি দিয়ে তাকে আগলে রাখবেন যেন আঘাত না পায়। বাবার উপর শিশুর বিশ্বাস, আস্থা এভাবেই বাড়তে থাকে। আজ দৃশ্যমান পিতার স্নেহাচার্য আগামী দিনে অদৃশ্য ঈশ্বরের ওপর তাকে নির্ভরশীল হতে সাহস জোগাবে। বাবার আলিঙ্গন, চুম্বন, আদর আজ তাকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে সে আছে ঈশ্বরের হাতে, যিনি সকলের পিতা। পরিবারের পিতা হওয়ার গৌরবে শিশু সন্তানকে ঘিরে সমস্ত পরিকল্পনা আয় রোজগার এবং ভবিষ্যৎ স্বপ্নের বাস্তবায়ন শিশুর দিকে তাকিয়ে, শিশুর মনের অজানা প্রশ্নের জবাবদাতা-বাবা ও মা, শিশু যদিও বেশীর ভাগ সময় মায়ের সাথে থাকে, মায়ের কাছে অজানা প্রশ্নের উত্তর নাও পেতে পারে। তাই অপেক্ষায় থাকে বাবা কখন বাড়ি আসবেন এবং প্রশ্নের উত্তর প্রদানে তাকে সন্তুষ্ট করবেন। প্রত্যেক মানব শিশুর এই অদম্য এবং অধীর আগ্রহের প্রশ্নের জবাব দানে তৃপ্ত করার নৈতিক ও মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে শিশুকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। বাড়িতে অনেক সময় অতিথি আসে। প্রয়োজনে তাদের অনেক সময় দিতে হয় আতিথেয়তা বজায় রাখতে। সে কর্তব্য কাউকে যেমন অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই; তদ্রুপ শিশুকে প্রয়োজন অনুযায়ী খেলার সাথী হয়ে সময় দিতে পারেন আলাপের সঙ্গী, গল্প বলা, প্রশ্ন উত্তর ইত্যাদি।

বাবার ইচ্ছাশক্তি ও বিচার-বিবেচনা : বাবা বড়, তাই ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারে এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা সন্তানদের মনে গেঁথে আছে। বিপদে, আপদে, তাদের অভাব ঘটলে আর কেউ পাশে না থাকলেও বাবাই সব ব্যবস্থা করবেন ও করতে পারেন এ ধারণা প্রত্যেক শিশুর। বাবার উপরে শিশুর এই আস্থার ফলে পরবর্তীতে সে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর হতে শিখবে। শিশুর প্রত্যাশা-বাবা তাঁর ন্যায়বোধ নিয়ে শিশুর প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে আসবেন। কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বা একতরফা বিচার করে শিশুর মন বিষিয়ে তুলবেন না। অপরাধ বিচার করা বা ছোট ভুল করা শিশুর বৈশিষ্ট্যও সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। অতএব উভয় দিক বিবেচনা করে শাস্তি ও শারীরিক অত্যাচার করার পূর্বে বিচারে ন্যায় ও সততার প্রকাশ ঘটে তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে কার্পণ্য করবেন না। শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে জন। সমতার আশ্রয় হল উত্তম বিচারকের কাজ। আপনি বাবা, আপনি শিশুর কাছে দৃশ্যমান আদর্শ-আপনার ক্ষমাশীল হৃদয়ের ছোঁয়ায় শিশু অনুভব করবে স্বর্গস্থ পিতার স্নেহশীলতা।

শিশুর ধর্মীয় বিশ্বাস বৃদ্ধিতে পিতার ভূমিকা : বাবার ঈশ্বর প্রীতি আর ধর্মভীরুতা শিশুদেরকে ঈশ্বর বিশ্বাসে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। যদিও বেশির ভাগ পরিবারে মায়ের সাথে শিশুদের প্রার্থনায় ও উপাসনায় যোগ দিতে দেখা যায়, তবে বাবাও এক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখে না। সময় সুযোগ পেলে সাথে করে শিশু সন্তানকে উপাসনায় অংশ গ্রহণে অভ্যাস করলে এক সময় তারাই বাবা মাকে উৎসাহিত করবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে। ধর্মীয় বিশ্বাস বৃদ্ধিতে পরিবারে শিশুদের সহায়ক ভূমিকা বাবা-না-ই রাখতে পারেন। পরিবারে পারিবারিক নিয়মিত প্রার্থনা ব্যবস্থা করা, শিশুদের দ্বারা বাইবেল পাঠ, প্রার্থনায় অংশগ্রহণ এক সময় তাদের মধ্যে জপমালা প্রার্থনা না করলে কি যেন বাদ পড়েছে বা অভাব অনুভব করবে। অতএব শিশুর ধর্মীয় বিশ্বাস বৃদ্ধি অক্ষুন্ন রাখতে মাণ্ডলীক শিক্ষা দেয়, সাক্রামেন্তের অনুশীলন অর্থাৎ গুরুত্ব উপলব্ধি করে ধর্মনিষ্ঠ মনোভাব পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

এফেসীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রে পিতাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে : তোমরা,পিতারা, তোমরা কিন্তু তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না, বরং প্রভুরই শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ করে তোল। *(এফেসীয় ৬ ঃ ৪)* হিব্রু ধর্মপত্রে পিতার শাসনের ফলে সাময়িক দুঃখ-কষ্ট পেলেও সন্তানদের মঙ্গল হয়, ধর্মনিষ্ঠ হয় তেমন ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। শাসনের মধ্য দিয়ে যারা শিক্ষা পেয়েছে, পরে কিন্তু তাদের জীবনে এই শাসনের ফলে আসে, শান্তি ও ধর্মিষ্ঠতা *(হিব্রু ১২ : ১১)*। ধার্মিক ও প্রার্থনাশীল মানুষ হয়ে ওঠার একটি সুযোগ পিতা-মাতার প্রার্থনার দ্বারা। ধর্ম শিক্ষার আদর্শে সন্তানদের ধার্মিকতারই দাস হয়ে ওঠে। *(রোমীয় ৬:১৭)*।

আদর্শ পিতা বলতে সন্তানদের অস্বীকৃতি : দশম শ্রেণিতে একদিন কোন এক ছাত্রকে তার জীবনে আদর্শ ব্যক্তি সম্বন্ধে রচনা লিখতে বলা হল। ছাত্রটি দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বলল-আদর্শ ব্যক্তি বলতে পিতা-মাতাকে সকলে বুঝে থাকে। কিন্তু আমার জীবনে বাবা-মা কেউ আদর্শ ব্যক্তি নন। শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করল কেন? ছাত্রটি উত্তর দিল: প্রতিদিন মা, বাবা অফিস থেকে আসার পর দেখি বাবার হাতের ব্রিফকেস নিয়ে আলমিরায় রেখে দেন। রাতের খাবার টেবিলে বাবাকে ছেলেটি জিজ্ঞস করল; বাবা তুমি মাসে কত টাকা মাইনে পাও? বাবা উত্তর দিলেন- সে বিষয়ে তোমার না ভাবলেই ভাল। আমি তো তোমার চাহিদার কোন কিছুর কমতি রাখি নাই। অর্থাৎ ছেলেটির বাবা অসৎ পথে টাকা রোজগার করে এবং মা তা জেনে কোন প্রতিবাদ না করে বরং তাকে উৎসাহিত করে। এ ঘটনার পর থেকে বাবা-মায়ের প্রতি ঐ ছেলেটির বলতে গেলে ঘৃণা জন্মাতে থাকে। কারণ সে বাবা-মার অসৎ প্রবণতা সহ্য করতে পারছে না বিধায় আদর্শ পিতা-মাতা বলেও সম্বোধন করতে অস্বীকার করছে। যদিও এমনটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তারপরও সে পরিবারে পিতা-মাতার মধ্যে সততা, ন্যায়-নীতি সন্তানেরা দেখতে পায়না, তাদের উপর খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কিভাবে সন্তানদের বড় করা যায় সে সম্পর্কে কবি বলেন : যে শিশু সমালোচনার মধ্যে-মানুষ হয় সে নিন্দা করতে শেখে। যে শিশু ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে মানুষ হয় সে শুধু ঝগড়াই করতে জানবে। যে শিশু ঠাট্টা, বিদ্রুপের মধ্যে দিন কাটায় সে সাধারণত লাজুক প্রকৃতির হয়। যে শিশু ধিক্কারের মধ্যে মানুষ হয় তার মধ্যে দোষী মনোভাব গড়ে ওঠে। যে শিশু সহনশীল পরিবেশে বড় হয় সে স্বাভাবিক ভাবেই ধৈর্যশীল। যে শিশু প্রতিটি কাজে উৎসাহ পায় সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে বড় হয়। যে শিশু তার কাজের প্রশংসা পায় সে কাজের মর্যাদা উপলব্ধি করে। যে শিশু ন্যায় পরিবেশে মানুষ হয় তার মধ্যে বিচার বোধ আছে। যে শিশু নিশ্চয়তার মধ্যে মানুষ হয় সে বিশ্বাস করতে জানে। যে শিশু তার কাজের স্বীকৃতি পায় তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠে। যে শিশু বন্ধু ও সহজ পরিবেশের মধ্যে বড় হয় সে পৃথিবীতে ভালবাসার সন্ধান পায়।

সমাপ্তি সূচক কথা : প্রত্যেক শিশুদের কাছে তার বাবা-মা মহৎপ্রাণ ও আদর্শ ব্যক্তি। আমার বাবা, আমার মা, লেখাটি সকল শিশুদের কাছে সমানভাবে প্রযোজ্য। যাদের ভালবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতায় লালিত-পালিত হয়ে বাবা-মার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে, তারা কোনদিন তাদের অসম্মান বা অমর্যাদা করতে পারেনা। কেবলমাত্র সুমধুর ডাকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং আশীর্বাদ লাভের জন্য বলতে পারে: আমার বাবা, আমার মা॥

একতা ও ভ্রাতৃত্বে যাপিত জীবন, করিবে তা শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপন

রনেশ রবার্ট জেত্রা

প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাকে (ঈশ্বর) পাওয়ার বাসনা দিয়ে। কিন্তু মানব জাতি পাপে পতিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। বর্তমান সময়েও মানুষ তা-ই করছে। কিন্তু ঈশ্বর মহাকৃপাশীল। তাই তিনি মানুষকে পাপ পথ ছেড়ে তাঁর সান্নিধ্যে আসার পন্থাও দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই পন্থাগুলো হলো- পরস্পরের সাথে একতা, সহভাগিতা, সহযোগিতা, মিলন, ন্যায্যতা, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সম্প্রীতি স্থাপন প্রভৃতি। যেগুলো চর্চার মাধ্যমে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের কারিগর হয়ে উঠি। যার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে পারি। মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির গুণে একতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করতে চায়। সম্প্রীতি (সম+প্রীতি) বলতে মানুষের সমমর্যদা এবং মানুষকে সমভাবে ভালোবাসা অর্থাৎ একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সমপ্রীতি করাই হলো সম্প্রীতি। অন্যদিকে শান্তি হলো- স্রষ্টার একটি বিশেষ দান, যা মানুষের অন্তরের একান্ত সম্পদ। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সবাইকে সম- ভালোবাসা বা সবার সাথে সম-প্রীতি করাই হলো সম্প্রীতি ও শান্তি স্থাপনের পূর্বশর্ত।

"মানুষের একা থাকা ভালো নয়" *(আদি ২:১৮)*। আদিপুস্তক *(১:২৬-২৮, ২:৭-২৪)* পদে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় দম্পতিই হচ্ছে "একাধিক ব্যক্তির মধ্যে মিলনের প্রথম মূর্তরূপ"। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে একতা ও সহভাগিতার মিলন গড়ে উঠে তা সন্তানদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। পরিবারে বাস করেই মানবজাতি ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে। পরিবারই হলো প্রাথমিক শিক্ষা নিকেতন বা কেন্দ্র। মানবিক এবং খ্রিস্টীয় গুণাবলীগুলো আমরা শিশুকাল থেকে পরিবারেই অর্জন ও চর্চা করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে, পরিবারের মধ্যেই আমরা একতা, সম্প্রীতি, সহভাগিতা, সহযোগিতা ভ্রাতৃত্ববোধের মতো মানবিক গুণাবলীগুলো শিখতে এবং চর্চা করতে পারি। পরিবারে পিতা-মাতা এবং অন্যান্য সদস্যগণ তা আমাদের শিশুকাল থেকেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম, ভালোবাসা, ক্ষমা এবং অন্যান্য নৈতিক এবং মানবিক গুণাবলীগুলো শিখিয়ে থাকেন। যার ফলে আমরা তা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, সর্বোপরি আমাদের সমগ্র জীবনে তা চর্চা বা প্রয়োগ করতে পারি এবং তা শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য করা আবশ্যক। তাই প্রথমত পরিবারেই আমাদেরকে এই সকল মূল্যবোধগুলো চর্চা করে পরিবারেই প্রথমত সম্প্রীতি ও শান্তি বন্ধন গড়ে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে পরিবারের পিতা- মাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকদের উচিত হবে সন্তানদেরকে যথ যথ সময় দেওয়া। পুণ্যপিতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট এর ভাষ্যমতে, পিতা-মাতাদের হতে হবে সন্তানদের দৃঢ়ভাবে সাহসী হতে এবং পরমেশ্বরের উপর একান্ত আস্থাশীল হতে অনুপ্রাণিত করা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু স্থানে নিজেদের সাথে এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে মারামারি, হানাহানি, সংঘাত, কাটাকাটি, বিবাদ পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল স্থানে আমরা যারা শান্তি ও সম্প্রীতিকামী মানুষ রয়েছি, আমরা যেন সাহায্য, সহযোগিতা ও সহভাগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। বিশেষ করে এই মুহূর্তে ইস্রায়েল ও ফিলিস্টাইন দেশের জন্য প্রার্থনা ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যারা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ রয়েছি, সকলেই আসুন আমরা একাত্ম হয়ে সে দেশের শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য প্রার্থনা করি।

প্রতিটি ধর্মই শান্তি ও সম্প্রীতির কথা বলে। প্রতিটি ধর্মের মূল বিষয় হলো-প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, একতা ও ভ্রাতৃত্ব, মানুষকে ঐক্য ও শান্তির বন্ধনে আগলে রাখা। অথচ আজ সেখানে নিজের এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিহিংসা, সহিংসতা, বিবাদ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের সাথে বিবাদ, বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা। ঈশ্বর মানুষকে কোনো ধর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেননি। তিনি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়েছি। তবে আমরা যে ধর্মেরই হই না কেন, মানুষ হিসেবে আমরা পরস্পরের ভাই-বোন। পরস্পরের সাথে সু-সম্পর্ক, একতা, ন্যায্যতা, সহযোগিতা, সহভাগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সম্প্রীতি বা সম-ভালোবাসার বন্ধনে মিলিত হয়ে শান্তি ও সম্প্রীতিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তা আমাদেরই কাজ। আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব নয়।

বর্তমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে বিশ্ব আজ নিস্তব্ধ। মানুষ আজ হতাশা ও নিরাশায় দিশেহারা। সম্প্রীতির দৃঢ় বন্ধনই পারে হতাশা, নিরাশা ও দিশেহারা করোনা থেকে বাঁচাতে। বর্তমান বাস্তবতায় রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে, সহভাগিতা, একাত্মতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী এবং ধর্মাবলম্বীর মানুষ। তারা ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি নির্বিশেষে সবার প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এমনকি নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তা করছেন। আর এই সেবামূলক কাজের মধ্যদিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কাজটি আরেক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। আমরা যখন এই দুঃসময়ে একে-অপরের পাশে সম্প্রীতির বন্ধনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারছি,

তাহলে স্বাভাবিক সময়ে পারব না কেন? আমরা মানব জাতি। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ উপহার বা দান। আমাদের ইচ্ছা শক্তিকে জাগ্রত রাখলে আমি-আপনি সকলেই নিশ্চয় সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারব। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখা যায় যে, অনেক মহামানব-মানবী শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য কাজ করে গেছেন। যেমন- আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা প্রমুখ আরো অনেকেই। যারা আজ ইতিহাসের পাতায় আমাদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। তারা আমাদের মতো রক্ত মাংসের মানুষ হয়েও যদি শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য কাজ করতে পারেন, তাহলে আমরাও নিশ্চয়ই পারবো। কারণ, সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে ইচ্ছা শক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, শান্তি ও সম্প্রীতির কারিগর হওয়ার জন্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-মানবরূপ ধারণ করলেন। সাধু আথানাসিউস বলেছেন- "ঈশ্বর মানুষ হলেন মানুষ যেন ঈশ্বর হয়"। এই উক্তিটি ধ্যান করে আমার ব্যক্তিগত অনুচিন্তন হলো- ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা। সকল মানবিক গুণাবলী 'ভালোবাসা' নামক সূত্রে গাঁথা। যেহেতু ঈশ্বর নিজেই ভালোবাসা, সেহেতু সকল মানবিক গুণাবলীর উৎস স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুর মধ্যদিয়ে মানবরূপ ধারণ করে শান্তি ও সম্প্রীতির একজন কারিগরের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখেছেন। যিশু নিজে মানুষের সাথে একতা, সহভাগিতা, সহযোগিতা, সম-অধিকার, সম-মর্যাদা ও ভ্রাতৃপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যা তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। পবিত্র বাইবেলের *(শিষ্যচরিত ১:১২-১৪, ২:৪২-৪৭, ৪:৩২-৩৫,৪:৩৬-৩৭, যোহন ৪:৪-২৬, মথি ৫:৪৩-৪৮, লুক ১০:২৫-৩৭)* পদ গুলোতে একতা, সহভাগিতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব, সম-ভালোবাসা এবং সম-মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট বলে একমাত্র মানব জাতিই পারে স্বার্থপরতা ত্যাগ করে ও ক্ষমতার অপব্যবহার না করে মানুষের সাথে মানুষের, এক জাতির সাথে আরেক জাতি, এক ধর্মাবলম্বীর ভাই-বোনদের সাথে আরেক ধর্মাবলম্বীর ভাই-বোনদের সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে, অন্য ধর্ম, কৃষ্টি-সংকৃতির মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা, সম-প্রীতি ও সম-মর্যাদা প্রদর্শন করতে এবং সকলের সাথে একতা, সহযোগিতা, সহভাগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করার মধ্যদিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। "ঈশ্বর মানুষ হলেন মানুষ যেন ঈশ্বর হয়। অর্থাৎ আমরা যেন ঈশ্বরের মতো ভালাবাসার মানুষ হয়ে উঠি। যার মধ্যদিয়ে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতির কারিগর হয়ে উঠি।

বলা হয় যে, সম্প্রীতি দিবসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো- বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব, সু-সম্পর্ক ও শান্তি-সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা।

তাই আসুন যে যেখানে এবং যে অবস্থায় আছি, এই করোনা মহামারীর মধ্যেও আমরা অতীতের সকল সীমাবদ্ধতা ভুলে একতা, সহভাগিতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব, সম-ভালোবাসা এবং সম-মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়ে সকল ধর্মের মানুষের সাথে একাত্মতায় শান্তি ও সম্প্রীতিময় বিশ্ব গড়ে তুলি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার-

১। ঈশ্বর ভালোবাসাময় (সাধু বেনেডিক্ট মঠ-২০০৮)।

২। খ্রিস্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার সারসংক্ষেপ।

৩। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী (সম্পাদকীয়): বর্ষ:৮০; সংখ্যা: ১৮,২০২০ খ্রি:।

৪। পবিত্র জুবিলী বাইবেল। ৯

যিশু হৃদয়ের উপচে-পড়া ভালবাসা

(৫ পৃষ্ঠার পর)

evil")। তার এই নীতির ভ্রান্ত নীতির ফলে কত যে মানব-সন্তানের জীবন বলি হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। তাই, শেষ পর্যন্ত শত্রু-পক্ষের সাথে শান্তি চুক্তি করে তার নীতির প্রায়শ্চিত্ত করছেন পরবর্তী প্রশাসন।

যিশু হৃদয়ের ভালবাসা প্রচলিত 'ন্যায্য ভালবাসা' ('Just love')-এর উর্ধ্বে। তাই তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাদেরকে প্রচলিত 'ন্যায্য ভালবাসা'র উর্ধ্বে উঠে তার বদলে বরং হৃদয়ের উপচে-পড়া ভালবাসা দিয়ে এমন ভাবে শত্রুর হৃদয় জয় করার সাধনা করা, যেন শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়। তাই তিনি 'ন্যায্য ভালবাসা' ('Just love')-এর বিরোধিতা করে তার চেয়ে আরো অনেক উন্নত, আরো অনেক মহান ও স্বর্গীয় ভালবাসার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: "কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: ওই ভাবে তোমরা দুর্জনকে প্রতিরোধ করতে যেয়ো না! বরং কেউ তোমার ডান গালে চড় মাররে মুখ ফিরিয়ে অন্য গালটিও তার দিকে পেতে দাও।" *(মথি ৫:৩৯)*

যিশু স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে, শত্রুকে পরাজিত করার সবচেয়ে সফল ও শক্তিশালী উপায় হলো ভালবাসা - ভালবাসা দিয়ে শত্রুর হৃদয় জয়। তখন শত্রু আর শত্রু থাকে না, শত্রু প্রশংসাকারীতে পরিণত হয়। তাই, যিশুকে যারা নির্মম নির্যাতন করে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল, সেই হত্যাকারীদের একজন যিশুতে বিশ্বাস করে বলেছিল: "সত্যিই উনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন"। *(মথি : ১১:২৮)*

এই অফুরন্ত ভালবাসার হৃদয়ের অধিকারী যিশু তাই দুর্বল, পাপী, অসহায়, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, ঘৃণিত, পতিতা, সমাজচ্যুত, সবাইকে তাঁর অন্তহীন ক্ষমা ও অসীম ভালবাসায় পূর্ণ হৃদয়ে আশ্রয় ও নতুন জীবন লাভ করতে সদা-সর্বদা ডেকে চলেছেন: "তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আরাম দেব!" যিশুর মধ্যেই সত্যিকার জীবন। তাই তাদেরকে জীবনের পূর্ণতার সন্ধান দিয়ে তিনি বলেন: আমি এসেছি, যাতে মানুষ জীবন পায়, পরিপূর্ণভাবেই তা পায়।" *(যোহন : ১০:১০)*

যিশু আমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, যেন আমরাও তাঁর এই উপচে-পড়া ভালবাসার সাধনা করি: "আমার আদেশ হলো এই: আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে।" *(যোহন ১৫:১২)* প্রতিদিন সবার সাথে; শত্রু-মিত্র, স্বজন-দুর্জন, ধনী-গরীব সবার সাথে - বিশেষভাবে, যাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা 'ফুরিয়ে' গেছে, যাদেরকে ভালবাসা আমাদের হৃদয়ের বাইরে রেখে দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদেরকে সেরা ভালবাসা উপহার দিয়ে নিজের হৃদয়কে, তথা, নিজের জীবনকেই যেন বিজয়ের শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করার সাধনা করি। ভালবাসার জয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ জয়॥ ৯

করোনাভাইরাস আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে

বেনেডিক্ট মূর্মূ

সেদিন ছিল সপ্তাহের শেষ কর্ম দিবস অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, অক্টোবর মাসের প্রথম দিন। সকাল থেকেই শরীরটা কেমন যেন ভাল লাগছিল না। বিকালে আরো বেশি খারাপ লাগতে শুরু করেছিল। অফিস ছুটির পর যেন কিছুই ভাল লাগছিল না। তাই সন্ধ্যার দিকে এক পর্যায়ে সুচিত্রাকে (আমার জীবনসঙ্গী) মোবাইল ফোনে বলেছিলাম; আজকে বাড়ি আসবো না। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। কত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি বাড়ি যাবার জন্য; বেতন উঠিয়েছি, ইলিশ মাছ, ফল, বিস্কুট, চ্যাঁপা কিনেছি বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। আমাদের ওদিকে আবার চ্যাঁপা পাওয়া যায় না। বাড়ি যাবার জন্য আগে থেকেই অন লাইনে ট্রেনের টিকেট কেটে রেখেছিলাম। না গেলে এগুলোর কি হবে? ফ্রিজে রাখা যাবে কোন কোনটা, আর সংসারে খরচের জন্য টাকা না হয় বিকাশে করে পাঠানো যাবে। কিন্তু ট্রেনের টিকেট বিক্রি করার মত সময়তো হাতে নেই। যা হোক বিমান বন্দর ষ্টেশনে গিয়ে দেখি যদি টিকেট বিক্রি করতে পারি তাহলে বাড়ি যাব না। আর যদি তা না হয় তাহলে বাড়ি থাকা। এমন চিন্তা মাথায় নিয়ে বিমান বন্দর ষ্টেশনে গিয়ে ওঠলাম। পরিশেষে ট্রেনের টিকেট বিক্রি করতে না পেরে নিজেই বাড়ি চলে গেলাম। ট্রেনে টিকেট কেটেছিলাম এসি কোচে যেন ঘুমাতে পারি সে চিন্তা করে। শরীরটা বেশি ভাল না থাকায় খুব শীত অনুভব করছিলাম। এক পর্যায়ে শীত কমানোর জন্য ব্যাগ থেকে শালটা বের করে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। তবুও শীত যেন একটুও কমছিলো না। যাই হোক এ অবস্থাতে সারারাত একটুও ঘুমোতে পারিনি। পরের দুইদিন সেই শীত যেন আমাকে ছাড়লোই না। সঙ্গে যোগ হলো শরীর ব্যথা। সুচিত্রার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলাম ডাক্তারী পরীক্ষা না করে কোন ওষুধ খাব না। তাই পরের দিন রাজশাহী সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলাম। ডাক্তার মহোদয় পরামর্শ দিলেন আগে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার। তাই পরের দিন অর্থাৎ ৫ অক্টোবর ২০২০ কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার জন্য নমুনা দিলাম। সন্ধ্যা বেলা হাসপাতাল থেকে আমাকে মোবাইল ফোনে জানানো হলো আমি কোভিড-১৯ পজেটিভ। সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্রাকে জানালাম। সুচিত্রাতো মহা বিপদে পড়ে গেল। এখন সে আমাকে নিয়ে কি করবে। ঘরে বয়স্ক মা, মেয়ে এবং মেয়ের ঘরে সাত মাস বয়সী এক নাতনী আছে। পরে রাতের খাবার যেমন-তেমন করে সেরে প্রস্তুতি শুরু হলো এখন কি করা যায়, কিভাবে সবাইকে নিরাপদ রাখা যায়। আলাপে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো; পরের দিন সকালেই মা'কে দিদির বাড়ি (কলিমনগর), মেয়ে এবং নাতনীকে তার শ্বশুরবাড়ী (কলিমনগর) রাজশাহী পাঠিয়ে দিতে হবে। সবাই একমত হলাম। কিন্তু মা'তো যেতে চাইছে না। সে কিছুতেই এখান থেকে যাবে না। মা জোরে জোরে কান্না করছে, বিলাপ করছে, কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমি কি মা? ছেলে-মেয়েদের অসুখের কথা শুনলে মা ছুটে আসে তাদের কাছে আর আমাকে তোমরা বাড়ি থেকে অন্য কোথাও যেতে বলছ? আমি কোথাও যাব না। আমার কিছু হলে হবে। যা হোক মা'কে নানানভাবে বোঝানোর পর মা রাজি হলো মেয়ের কাছে যেতে।

আমার শরীরটা যেহেতু বেশি ভাল ছিল না, সামান্য জ্বর-জ্বরভাব ছিল তাই আমি ঢাকা থেকে এসেই আমাদের একটি থাকার রুমে একাই আলাদা থাকা শুরু করেছিলাম। নমুনা পরীক্ষার ফলাফল না আসা অবধি পরিবারের অন্যদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেই চলাফেরা করছিলাম। তারপর পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পরতো আলাদা থাকতেই হবে সেটা পরিষ্কার। ঐ যে আমি আলাদা রুমে থাকা শুরু করেছিলাম সেই রুমই (১২ফিট বাই ১২ফিট) এখন আমার পৃথিবী। পার্থক্য হলো নমুনা পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ঘরের দরজা-জানালা খোলা থাকতো, এখন পুরোটাই বন্ধ করা হলো। আগে ডাইনিং-এ (একা একা) বসে খেয়েছি। এখন ঐ রুমই আমার সব। খাবার-দাবার প্রস্তুত করে রুমের দরজার কাছে একটি ছোট্ট টেবিলে রেখে দিয়ে আমাকে ডাকা হতো। আমি প্রয়োজনীয় খাবারগুলো রুমের ভেতরে নিয়ে যতটুকু পারতাম ব্যবহার করতাম। খাবার পর কোনমতে দরজা খুলে ছোট টেবিলে রেখে দিতাম। আমার ব্যবহৃত থালা-বাটি, গ্লাস, মগ হ্যান্ড গ্লাভস পরে কলের পাড়ে নিয়ে গিয়ে গরম পানি দিয়ে ভালমত ঘসে ঘসে পরিষ্কার করে রাখত।

সে সময়ে ঐ রুমেই থাকতাম। আমাকে প্রয়োজনীয় সবকিছু (খাবার ও ঔষধসহ) সরবরাহ করা হতো। পরিবারের কারো সাথে বিশেষ দেখা, কথা হতো না। মোবাইলে কারো সাথে কথা বলতে ভালোও লাগতো না। আর তাছাড়া আমার ওখানে নেটওয়ার্কের কমতি থাকায় বেশিরভাগ সময়ই রুমে নেট পাওয়া যায় না। কথা বলার থাকলে বাড়ির বাইরে বা ছাদে গিয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলতাম।

সে সময় আমার খাবারের কোন রুচিই ছিল না। খাবার দেখলেই খারাপ লাগতো। খাবারের কথা বললেই মেজাজটা খারাপ হয়ে যেত। খাবারে কোন ইচ্ছাও ছিল না আমার। প্রথম দিকের ৭/৮দিন আমি তেমন কিছুই খেতে পারিনি। কোন কিছু ভালো লাগতো না। কোন গন্ধ পেতাম না। কোন স্বাদও বুঝতাম না। খাবার খেতে বিশেষ করে চিবিয়ে খাওয়ার মত শারীরিক শক্তি আমি হারিয়েছিলাম। পরিবারের মানুষের বকা-ঝকা এড়িয়ে যাবার জন্য তাই কোন রকমে ভেজিটেবল স্যুপ, মাল্টার রস, ডাবের পানি, ভাতের মাড়, গরম পানি পান করতাম। যা খেতাম তা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারতাম না, কিছুক্ষণ পরেই বমি হয়ে যেত। যেহেতু একা একা আলাদা রুমে থাকতাম তাই কেউ জানতো না। খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম যদি পরিবারের লোকজন জানে তাহলে বকা খেতে হবে। তাই যখন বমি আসতো তখন বেশি করে পানির টেপ খুলে রাখতাম যেন বাইরে থেকে শুধু পানি পড়ার শব্দ শোনা যায়। তারপর থেকে অল্প অল্প করে খেতে পারতাম। আমার খুব ভালো করে মনে আছে ঠিক ৮ দিনের পর আমার আর কোনমতেই যেন শরীর চলছে না। কোন শক্তি ছিল না। বার বার মনে হচ্ছিল "আমি কি আগামীকাল সকালের দেখা পাবো?" অষ্টম দিন গিয়ে সন্ধ্যার পর আমার শরীর যেন আর চলছেই না। কারো সাথে কথা বলতেও ইচ্ছা করে না। কোন শক্তি নেই। বাঁচবো কি না তাও জানি না। আমি আমার ছোট বোনকে ডেকে বললাম; দিদি আমার ক্ষুধা লাগছে। আমার ক্ষুধা লাগছে এই কথা শুনে আমার বোনের যে আনন্দ, সে খুব খুশি। সে দৌড়ে গিয়ে সুচিত্রাকে বলছে, দাদার ক্ষুধা লাগছে, দাদাকে খেতে দিতে হবে, বৌদি তুমি কোথায় এক্ষুনি আস। দাদা খেতে চাইছে। বোন আমার কাছে এসে জানতে চাইলো আমি কি খেতে চাই। আমি বললাম, ভাত খেতে ইচ্ছা করছে। কথা বলা শেষ না হতেই

সে দৌড়ে গিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে আসলো। দাঁড়িয়ে থেকে দেখলো আমি খেতে পারছি কি না। আমি অল্প কিছু ভাত খেতে পেরেছিলাম। সেদিন থেকে আস্তে আস্তে খাবার খাওয়ার প্রতি টান আসতে শুরু করে। ঠিক ষোলদিনে দ্বিতীয় বারের মত কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার জন্য নমুনা দেই এবং রেজাল্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু শরীর এত ক্লান্ত ছিল যে, বেশিক্ষণ বসে থাকতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, কথা বলার মত শক্তি ছিল না। তাই কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে ২৭ অক্টোবর ২০২০ ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হই এবং পরের দিন ২৮ অক্টোবর ২০২০ অফিসে যোগদান করি। আমি অনেকের চেয়ে ভাগ্যবান যে, ইতোমধ্যে আমি কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণ সম্পন্ন করতে পেরেছি।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে পরিবারের কেউ আমার খুব কাছাকাছি আসতে চাইতো না। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। সে সময় সুচিত্রাকে দেখেছি প্রতি রাত তিন/চারবার করে আমার দরজার কাছে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে দেখে যেত। সে মনে করতো, আমিতো কুম্ভকর্নের মত ঘুমাই সে কারণে মনে হয় আমি কিছু বুঝতে পারবো না। কিন্তু আমারতো এখন আর আগের মত চোখে ঘুম নেই। সে কারণে আমিও তাকে দেখতাম। কথা হতো না। সে অনেক মন খারাপ করতো। তার ভালো লাগতো না জানি। কিন্তু কিছু করার নেই। করোনা ভাইরাস মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জীবাণু, স্বামী-স্ত্রী, মা-সন্তান, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনদের মাঝে ফারাক সৃষ্টির জীবাণু। সমাজে বসবাসকারি মানুষগুলোকে একঘরে করার জীবাণু। এ জীবাণু বড়ই নির্দয়। এ জীবাণু একদমই চাই না; একাধিক মানুষ একসাথে থাকুক। একে অন্যকে খুব কাছে থেকে সময় দিক। একজন অন্যজনকে খুব কাছে থেকে ভালবাসুক। আমার পূর্বের অভ্যাস অনুসারে আমি যে কোন সময়ই ঘুমাতে চেয়েছি (হোক সে সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, বাসে কিংবা ট্রেনে) ঘুমাতে পেরেছি এবং ঘুমিয়েছিও। কিন্তু কোভিড-১৯ আমার সে ঘুম এখন কমিয়ে দিয়েছে। এখন আর যখন-তখন তো নয়ই, রাত্রেও ঘুম আসতে চায় না। শুধু ক্লান্ত অনুভব করি।

করোনাভাইরাস আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। সুচিত্রা ও আমার ছোট বোনের অকৃত্রিম ভালোবাসা, দায়িত্বশীলতা এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস এ যাত্রায় করোনাকে পেরে উঠতে দেয়নি। আমার ছোট বোনতো দাবি করেই বসেছে। দাদা আমি এসে গিয়েছি, তোমার কিছু হবে না। তোমার কাছে গেলে, তোমাকে স্পর্শ করলে, তোমার সেবা করলে করোনাভাইরাস আমার কিছু করতে পারবে না। আমাকে ছুঁতেও পারবে না। তাই তোমার দুঃশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আমি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করবো। যার ফলে সে সাহস নিয়েই আমার রুমে হরহামেসা খুব কাছ থেকে সেবা দিয়েছে, রুম পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে যা প্রয়োজন তা করেছে।

করোনাভাইরাস অন্যভাবে আমাদের সাথে সমাজের মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। তাইতো গ্রামের কিছু কিছু মানুষ আমাদের দেখলেই খারাপ মন্তব্য করতো। আমাদের পরিবারের মানুষদের দেখলেই তারা খুব খারাপ মন্তব্য করতো। কেউ যেন আমাদের বাড়ির দিকে না আসে সে জন্য সবাইকে নিষেধ করে দিতো। এলাকার ভ্যান চালকদের নিষেধ করে দিয়েছিল যেন আমাদের পরিবারের কাউকে ভ্যানে না নেয়া হয়। যার ফলে আমাদের পরিবারের সদস্যরা এতদিন পায়ে হেঁটে বাজারে কেনাকাটা করতে গিয়েছে। গ্রামের কোন কোন মানুষের কাছে আমি হয়তো বড় কোন অপরাধী মনে করেছে। নয়তোবা কোন পাপী মানুষ, আমাকে দেখলেই সবাই অশুভ/অশুচি হয়ে যেতে পারে। গ্রামের অনেকেরই সন্দেহ ছিল যে, আমি কি আদৌ ফিরে আসতে পারবো কি না। তবে অন্য দিকে গ্রামের অনেকেই প্রতিদিন রোজারিমালা প্রার্থনায় স্মরণ করতেন। আমি যখন একটু একটু করে খেতে পারছিলাম দেখে গ্রামের বেশ কয়েকটি পরিবার একেক দিন একেক পরিবার থেকে খাবার দিয়ে যেত। আমাদের বাড়িতে মুরগি দিয়ে যেত যেন আমাকে রান্না করে খাওয়ানো হয়। সুস্থ হয়ে এক সন্ধ্যায় যখন আমাদের বাড়িতে রোজারিমালা প্রার্থনায় আয়োজন করা হয়েছিল সেদিন অনেক পরিবার থেকে প্রার্থনায় যোগদান করেছিল। সে সাথে করোনভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা (কিভাবে আক্রান্ত হলাম, কেমন লাগতো, কিভাবে সেরে উঠলাম) আমার কাছ থেকে শুনতে চেয়েছিল। তখন অনেকে বিশেষ করে মায়েরা মত প্রকাশ করেছিল যে, তারা প্রতিদিন আমাকে তাদের প্রার্থনায় স্মরণ করেছিলেন। আমি সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। সত্যি বলছি, সে সময় আমি মনে হয় ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। সারাদিন প্রার্থনা করতাম। ছোট থেকে যতদূর মনে পড়ে সমস্ত স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করতাম। আমার সব পাপগুলোর কথা মনে করে অনেকবার ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা চেয়েছি। এও মনে হয়েছিল; আমি যদি মরেই যাই তাহলে তো পাপস্বীকার করার সুযোগও পাবো না। তাই প্রতিদিনই ঈশ্বরকে আমার পাপময়তার কথা মনে করিয়ে দিতাম। তবে সে সময় আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু ঈশ্বর সব কিছু সামলে নেয়ার শক্তি যুগিয়েছেন।

করোনা ভাইরাস মোকাবেলা যেভাবে সম্ভবঃ

প্রথমতঃ নিজের শক্ত মনোবল (আমি করোনাকে পরাজিত করবো দূরত্ব বজায় রেখে, সাবান দিয়ে বার বার হাত ধুয়ে, ডাক্তারী পরামর্শ অনুযায়ী পথ্য সেবনের মাধ্যমে, তাকে পরাজিত করতে আমি বদ্ধ পরিকর)।

দ্বিতীয়তঃ জীবন সঙ্গী এবং পরিবারের অন্যান্যদের ইতিবাচকভাবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা এবং পূর্ণ সমর্থন (আমরা সর্বদা তোমার সঙ্গে আছি। এটা সত্যিকারভাবে, এটা কোন অভিনয় বা কথার কথা নয়)।

তৃতীয়তঃ ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা এবং পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যে, আমি অবশ্যই সুস্থ হবো, কারণ ঈশ্বর আমার সঙ্গে সদা বিরাজমান। আমি সদাপ্রভু দ্বারা পরিচালিত।

আমার অনুভূতি অনুসারে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ই পারে করোনাভাইরাসের মত জীবাণুকে পরাজিত করতে॥

ফ্ল্যাট ভাড়া

১২ সার্কিট হাউজ, রোড কাকরাইল **"ষড়নিকেতন"** রমনা ঢাকা, তিন রুমের ফ্ল্যাট (২য় তলা) ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগ

০১৭১৩-০৩৯৫৯২
০১৭৫২-২৫০৫৯৮

বিজ্ঞ/১৮২/২১

বাংলাদেশের স্বীকৃতিবিহীন মুক্তিযোদ্ধারা
(The Unsung Freedom Fighters of Bangladesh)

বার্থা গীতি বাড়ৈ

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গণ আন্দোলন যখন আমার স্মৃতিতে দানা বাঁধতে শুরু করে তখন আমরা চট্টগ্রামের পাহারতলীর, বাটালিহিলের নীচে মতিঝর্ণায় থাকতাম। প্রতিদিন ভোরে মা এবং সব ভাইবোন একটি বেবী ট্যাক্সি যোগে মতিঝর্ণা থেকে পাথরঘাটায় আসতাম। পাথরঘাটাস্থ সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলে মা শিক্ষকতা করতেন ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে। মা ও বড় ভাই ডমিনিক রয় সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলে আর আমরা তিন বোন (মেরী, গীতি, স্মৃতি) সেন্ট স্কলাসটিকাস স্কুলে পড়তাম। ছোট দুই ভাই (জেম্‌স ও জন) ঘরেই থ াকতো, কারণ ওদের তখনো স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি। স্কুল ছুটি হলে বড়দা আর বড়দি রিক্সা করে বাসায় ফিরে যেত। আমরা ছোট দুই বোন তেরেজা মাসির (ডানকান ও মলি চৌধুরীর মা ও আমাদের স্কুলের সেলাই শিক্ষিকার) বাসায় তার সাথে যেয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে পড়তে বসতাম। মা তাঁর স্কুল থেকে বের হয়ে, ছাত্র পড়িয়ে পড়ন্ত বিকেলে আমাদের নিতে আসতেন। একদিন রিক্সাযোগে মতিঝর্ণার বাড়ীতে ফেরার পথে পাহারতলীতে জীবনের প্রথম মশাল মিছিল তথা প্রতিবাদ আন্দোলনের স্বরূপ দেখলাম। ছোট মানুষ- ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মা তখন ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভয় পাওয়ার কিছুই ছিল না, কারণ আন্দোলনকারীরা সব ছিল বাঙালী এবং বাঙালীর কিছু ন্যায্য দাবী পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে আদায় করার জন্যই ছিল এই আন্দোলন। এতদূর থেকে স্কুলে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মা আমাদেরকে নিয়ে মতিঝর্ণায় নিজেদের বাড়ী ছেড়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাথরঘাটায় নজুমিএগ্রা লেইন এ ভাড়া বাসায় উঠলেন। পরে বুঝেছিলাম যে - এই বাসা পরিবর্তন আমাদের জন্য কতটাই না মঙ্গলজনক ছিল; আমরা স্ব-পরিবারে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম। কারণ এর কিছুদিন পর "নুরু" নামক কুখ্যাত বিহারী কসাই মধ্যরাতে বাড়ীর বাইরে থেকে ধারালো চাপাতি হাতে আমাদের নিযুক্ত দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বিধবা কুসুম মাসিকে শাষিয়ে গিয়েছিল। পরদিন কুসুম মাসি তল্পি তল্পা গুটিয়ে পাথরঘাটায় আমাদের বাসায় এসে হাজির। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চের শেষের দিকে আমাদের মতিঝর্ণার বাড়ীঘর আর গরু-ছাগল সব লুটপাট হয়ে গেল। ১৯৭০ সালের শুরু থেকেই মা ধীরে ধীরে সক্রিয় স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়লেন। বিভিন্ন মিটিং মিছিলে যাওয়া শুরু করলেন তার স্কুলের শিক্ষকতা ও টিউশনির পাশাপাশি। বাবা তখন মালুমঘাটে বিদেশী মিশনারীদের সাথে কাজ করতেন, তাদের ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং কালে ভদ্রে চট্টগ্রাম শহরে এসে আমাদের দেখে যেতেন।

ইতিপূর্বে ১৯৭০ এর নভেম্বরে এক প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছাকৃত অবহেলায় বাংলার হাজার হাজার পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী কুকুর বেড়ালের মত মারা গেল। ১৪-১৫ ফিট জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেল খর কুটোর মত উপকূল ও দ্বীপবাসী মানুষেরা। মা প্রতিদিন স্কুল থেকে আসার পথে ২/৪ জন অনাহারী মানুষকে সাথে নিয়ে ফিরতেন। আমাদের জন্য তৈরী খাবারের কিছু অংশ তাদের খাইয়ে দেয়া হত। এরপর মায়ের স্ব-প্রনোদিত দায়িত্ব ও কর্তব্য শুরু হল ঘরে ঘরে গিয়ে খাদ্য ও কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করে কিছু পরিমাণ জমলে, তা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলবাসী গ্রামের মানুষদের মধ্যে বিলি করে দিয়ে আসা।

তৎকালীন পাকিস্থান সরকার ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস তেমন গুরুত্বের সাথে প্রচার করেনি, পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে বিপদগ্রস্ত মানুষকে রক্ষা বা উদ্ধারের সক্রিয় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পর্যাপ্ত ত্রাণ-কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। ফলে বাঙালীদের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা দিলে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে দুটি ভিন্ন রাষ্ট্র হয়ে গেল। বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানীদের দ্বারা ক্রমাগত অর্থনৈতিক শোষণ ও চাকুরি ক্ষেত্রে পদ-বঞ্চনা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে অবহেলা এবং পাকিস্তানের নির্বাচনে বাঙালীর নিরঙ্কুশ জয়ের ফলাফল মেনে না নেয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীর স্বাধীকার আন্দোলন আরো জোরালো রূপ ধারণ করলো। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ বিশ্বের সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণের মাধ্যমে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মহা ডাক দেন। যার যা আছে, তাই নিয়ে পশ্চিমা শোষক-গোষ্ঠির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালীর প্রতি।

সারাদেশে এবং চট্টগ্রামেও সেই আন্দোলনের ঢেউ তীব্রভাবে আঘাত হানে। চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড্‌স্ হাই স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল, মি: জে. এল ম্যান্ডেজ মহোদয়ের সভাপতিত্বে। মায়ের সাথে আমরাও ওই সমাবেশে যোগ দিয়েছিলাম। সারাদেশে, বিশেষ করে ঢাকার পরিবেশ অত্যন্ত থমথমে হয়ে উঠেছিল। ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বঙ্গবন্ধু ও পাকিস্তানের প্রতিনিধি জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে কয়েক সপ্তাহ আলোচনা চলার পরও কোন সমাধান হয়নি। কারণ, নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরুঙ্কুশ জয়ের পরও পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীকে শাসন কার্য পরিচালনায় তাদের ন্যায্য অধিকার ও পাওনা পদ দিতে অস্বীকার করেছিল; বাঙ্গালীর ছয় দফা দাবী তারা মেনে নিতে চাচ্ছিল না। তাই, এই আলোচনা চলাকালীন সময়েই বিনা উস্কানিতে কাপুরুষের মত পশ্চিম পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনী কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে কামান, মেশিনগান ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে নিরীহ ঘুমন্ত বাঙ্গালীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে। ঐ কাল রাতে হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক, পুলিশ-জনতা নৃশংসভাবে খুন হয় পাক বাহিনীর হাতে। মানুষ প্রাণ ভয়ে মাইলের পর মাইল পথ, নদী-নালা পার হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে দিক-বিদিক ছুটতে থাকে। বঙ্গবন্ধুকে রাতের আঁধারে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে বন্দী করে রাখা হয়।

যুদ্ধের উত্তপ্ত আঁচ চট্টগ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ও ২৮ মার্চ সকালে চট্টগ্রামের আকাশে বোমারু বিমান টহল দিতে থাকে। আমার দশ বছরের কিশোর বড় ভাই ডমিনিক অতি উৎসাহে ছাদে উঠে বাইনোকূলার দিয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করছিল। হঠাৎ ওর কানের পাশ দিয়ে শোঁ শোঁ করে কয়েকটি গুলি চলে যায়। ও হুড়মুড় করে হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এসে এই কথা বাসার সবাইকে জানায়। মা ওকে খুব করে বকে দিলেন, কারণ পাক্ বাহিনী অনুসন্ধান করতে করতে সন্ধান পেলে সবাইকে মেরে একেবারে নির্বংশ করে দিত।

এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র সেলিম ভাই (মতিঝর্ণায় থাকাকালীন সময়ে আমার বড় দুই ভাই বোনকে কিছুদিন প্রাইভেট পড়িয়েছিলেন) এসে মাকে অনুরোধ করলেন, "মাসিমা আমাকে শুধু আজ রাতটা থাকার জন্য আশ্রয় দিন। কাল ভোরে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে কর্ণফুলি নদীর ওপাড়ে চলে যাবো।" মা আর কুসুম মাসি সেলিম ভাইকে আদর যত্ন করে খাইয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা প্রায় সারারাত সেলিম ভাই এর হাহাকার শুনলাম পাশের রুম থেকে। তিনি অনবরত খোদার কাছে ফরিয়াদ করছিলেন, জালিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাত থেকে যেন দেশ বক্ষা পায়। মা আমাদের রুম থেকেই সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলেন "সেলিম, বাবা তুমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা কর, মহান সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই আমাদের সবার প্রার্থনা শুনবেন, এই জালিমদের হাত থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করবেন; দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনলাম, সেলিম ভাই ভোরেই চলে গেছেন। স্বাধীনতার পর ওনার মুখেই শুনেছিলাম যে, উনি মুক্তিযোদ্ধাদের নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে পাকিস্তানীদের অনেক যুদ্ধজাহাজ, ব্রীজ, কালভার্ট রাতের আঁধারে, চুপিসারে সাঁতার কেটে যেয়ে, মাইন ফিট করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। মায়ের সহযোগিতা পাবার কারণে তার মত মুক্তিযোদ্ধাগণ যুদ্ধশেষে মাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিলেন।

কয়েকদিন পর সন্ধ্যার দিকে দীর্ঘ ও শীর্ণ দেহী সাদা ধূতি পরিহিত এক বৃদ্ধ মানুষ এসে হাজির হলেন আমাদের নজুমিঞা লেইন এর বাসায়। দেখলাম তিনি মাকে স্বপরিবারে ওনার বাসায় চলে যাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করছেন আর মা বলছেন "মেসো, আমার স্বামী থাকে সেই সুদুর মালুমঘাটে, আমি ছয় জন ছেলে মেয়ে নিয়ে এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কিভাবে আপনার বাসায় যাই। বৃদ্ধ এক পর্যায়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে অনুরোধ করা শুরু করলেন। তার ধারনা আমরা খ্রিস্টান, তাই পাকিস্তানীরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। মা হায় হায় করে বলে উঠলেন "একি করছেন মেসো! আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমার বান্ধবীর সম্মানিত শ্বশুর মশাই। - ঠিক আছে, আমি আমার সন্তানদের নিয়ে দুই এক দিনের মধ্যেই চলে আসবো।" আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে ঠেলাগাড়ী, রিক্সায় বা পায়ে হেঁটে মালপত্র নিয়ে পাথরঘাটা পবিত্র জপমালা রানীর গির্জার পাশে, ফাদার বুদ্রোর হাসপাতালের সামনে, R. C. Church Road-এর মাথায় ডা: দত্তের দোতলা বনেদী বাড়ীতে উঠে আসলাম। বেচারা বৃদ্ধ দত্ত মশাইকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে তাঁর পুত্র বিখ্যাত চিকিৎসক ডা: নিরঞ্জন দত্ত, স্ত্রী ও দুই যুবা পুত্রকে নিয়ে কোলকাতায় গিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। বাড়ী রক্ষায় একজন বিধবা দাসীর (ভবানী) তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধ দত্ত মশাইকে রেখে গিয়েছিলেন। এখন আমরা এই বাড়ীতে আসার ফলে অসহায় বৃদ্ধ দত্ত মশাই যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেলেন। মা তার নিজের বিবেককে জাগ্রত রেখে দত্ত মশাইকে ভাড়া দেয়া শুরু করলেন। যদিও ওনাদের বিশাল এই সম্পত্তি, দালান-কোঠা রক্ষায় জীবন বিপন্ন করে মা আমাদের নিয়ে ওই বাড়ীতে উঠেছিলেন। ফিরিঙ্গিবাজারে দত্তদের যে বিশাল ঔষধের দোকান ছিল তা' যুদ্ধ পরিস্থিতি শুরুর আগেই টের পেয়ে, বন্ধ করে দিয়ে, পূর্বেই সব ঔষধের বাক্স এই বাড়ীর উপর আর নীচ তলার বিশালাকৃতির খাটগুলির নীচে মজুদ করে রাখা হয়েছিল। তাই বলতে গেলে যুদ্ধে দত্ত বাবুদের তেমন কোন ক্ষতিই হয়নি। এমনকি আমাদের ডেটল বা কোন ঔষধের প্রয়োজন হলে, তা এই মজুদ থেকে আমরা নগদ টাকায় কিনতাম। গাছের লেবুগুলিও পাকিস্তানী এক রুপিতে ১৬টা হিসাবে কিনতাম । বাড়ীর ভিতরে পিছন দিকে একটা সুগভীর কূপ ছিল যার মধ্যে যত সব দামী কাঁসা, পিতল ও রূপোর বাসন কোসন, পূজোর সরঞ্জাম পানির নীচে লুকানো ছিল এবং সুরক্ষিত ছিল।

আমরা ওই বাড়ীতে উঠার সাথে সাথে তা' একটা বিশাল অতিথিশালায়, তথা আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হল। মাকে দিদি (ধর্মের বড় বোন) ডাকা পূর্ব পরিচিত দুই ভাই সুরঞ্জন মামা ও পল মামা এসে আশ্রয় নিলেন। একাত্তরে পাক-বাহিনীর অত্যাচার শুরু হবার সাথে সাথে পূর্ব-পাকিস্তানী বাঙালীদের প্রাণ বাঁচাবার তৎপরতা শুরু হয়। ভারত ও বার্মা সীমান্তে পৌঁছতে পারার আগে অনেক শরনার্থী নির্ভরযোগ্য দেশবাসীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে সুবাদে প্রবর্তক সংঘের প্রধান শিক্ষিকা মীরা সিং তার বোর্ডিং এর যুবতি ছাত্রীদের নিয়ে পাথরঘাটার ক্যাথলিক চার্চের ধার্মিক পুরোহিত ফাদার শিমন থেটার আশ্রয় প্রার্থী হন। আমার মা ঐ ফাদারের স্নেহের পাত্রী ছিলেন বিধায়, তিনি মায়ের ঘরে রাখার জন্য তাদের পাঠিয়ে দেন। তারা কিছুদিন আমাদের ঘরে ও পেছনের এক হিন্দু পরিবারে থাকার পর বোরখা পড়ে পালিয়ে ভারত চলে যান। আরো কতক পরিচিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের ঘরে সাময়িকভাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিলেন অবিভক্ত বাংলার ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা সূর্য সেনের, এক নারী শিষ্যা/সহ-যোদ্ধার দুই যুবতি কন্যা। কিছুদিন পরে তারা সুযোগ বুঝে ফিসারী ঘাট দিয়ে নদীপথে কিছু লোকজনের সহায়তায় নিরাপদ আশ্রয়ে বা বর্ডার অতিক্রম করে ভারত চলে যান। এইভাবে পালাক্রমে পাক নরপশুদের হাত থেকে যুবতীদের রক্ষা করার জন্য মা সহযোগিতা করতেন। একদিন এক অশিতিপর বৃদ্ধা (সম্ভবত: দত্তদের আত্মীয়া) কোত্থেকে জানি এসে হাজির হলেন। তিনি যুদ্ধকালীন প্রায় পুরোটা সময় আমাদের সাথে রয়ে গেলেন। নিরামিশভোজী, তাই বাড়ীর অপর বিধবা দাসী ভবানী মাসির সাথে মিলে মিশে রান্না করে খেতেন। বৃদ্ধা আশেপাশে বিক্রি করে রোজগারের আশায় প্রতিদিন সকালে ডালের বড়ি শুকাতে দিতেন বাড়ীর ছাদে। সেই বড়িও মা বৃদ্ধার কাছ থেকে নগদ রুপিতে কিনে নিতেন আমাদের খাওয়ার জন্য। আজ পর্যন্ত সেই রকম স্বাদের ডালের বড়ি আর খেতে পাইনি।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মাঝে-মাঝে স্কুল বন্ধ হয়ে যেত, সরকারী নির্দেশে আবার তা' খুলেও দেয়া হত। পাকিস্তান সরকার পুরো বিশ্বকে বুঝাতে চাইতো, "কোথাও কোন গণ্ডগোল নাই Everything is under control. শুধুমাত্র ভারত সরকার দ্বারা নিয়োজিত গোয়েন্দা বাহিনী দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কিছু বিপথগামী হিন্দু জনগোষ্ঠি মাঝে মধ্যে গণ্ডগোল করার চেষ্টা করছে।" সরকারি নির্দেশে যথারীতি স্কুলগুলো খুলে যেত, কিন্তু মুক্তিবাহিনী বা ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা কোন আক্রমণ হলেই আবার সেগুলো বন্ধ হয়ে যেত। সরকার কার্ফিউ জারি করতো, বিশেষত : সন্ধ্যা থেকে ভোর রাত পর্যন্ত, রাস্তাঘাটগুলো জনমানব শূন্য হয়ে পড়তো, শুধুমাত্র পাক সেনারা সশস্ত্র টহল দিত পুরো শহর জুড়ে; রাস্তা ঘাটে কোন মানুষ দেখলেই গুলি করার নির্দেশ ছিল ফলে; সব মানুষ অসহায়ের মত গৃহবন্দী হয়ে থাকতো।

কার্ফিউ না থাকলে বা কার্ফিউ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা সারা বিকাল সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুল, গির্জা প্রাঙ্গণ এবং কবরস্থানে মহানন্দে খেলাধূলা করে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরতাম। রবিবারে যে সব বেলুচিস্তানী খ্রিস্টান পাক সেনারা গির্জায় (মিশায়/প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে) আসতো তারা আমাদের মত ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে আদর করতো, পকেট থেকে কাজুবাদাম, আখরোট, চকলেট ইত্যাদি বের করে খেতে দিত। হয়তোবা স্বদেশে (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে) ফেলে আসা পরিবার, পরিজন, সন্তানদের কথা তাদের মনে পড়তো আমাদের দেখে। এদিকে কিন্তু, বিশপ হাউজের নীচতলায় ফাদার শিমন থেটা তাঁর চৌকির তলায় অনেক হিন্দু পরিবারের সোনা দানার পুটলী যার যার নাম লিখে গচ্ছিত রেখে ছিলেন (যা স্বাধীনতার পর সবই ফিরে এসে অক্ষত অবস্থায় ফেরত পেয়েছিলেন)। ফাদাররা শত-শত ক্রুশ এবং রোজারীমালা অকাতরে বিলিয়েছিলেন হিন্দু জনগোষ্ঠির মাঝে যেন তারা সেগুলো গলায় ঝুলিয়ে খ্রিস্টান হিসাবে প্রাণ রক্ষা করতে পারেন। একজন খ্রিস্টান বেলুচ সেনা, পাক সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পোস্টিং ছিল চট্টগ্রামে। তার সৈন্যদের তিনি হুকুম দিয়েছিলেন যেন কোন খ্রিস্টানের উপর কোনরূপ নির্যাতন করা না হয়॥ **(চলবে)**

বৃষ্টি ধারায় এই বর্ষায়

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

বর্ষার চোখজুড়ানো রূপ মুগ্ধ করে। ভালো লাগে বর্ষার সদ্য স্নাত স্নিগ্ধ প্রকৃতি। অবারিত মাঠ, টলমলে পানির পুকুর, ভেজা সবুজ পাতা, ঘাস। বর্ষায় বৃষ্টিধোয়া প্রকৃতির রূপে চোখ জুড়ায়। মন ভরে যায়। প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়। কী শান্তি! আবহমান বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্য নিয়ে আসে বর্ষা। বর্ষা এলে নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে টইটম্বুর হয়ে যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। বর্তমানে প্রকৃতির নিয়মে বর্ষা আসে ঠিকই কিন্তু তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ছোটবেলায় যেভাবে বর্ষাকাল দেখেছি সেভাবে এখন কিছু নেই বললেই চলে। নদী-নালা, খাল-বিল ভরে বর্ষার যে জোয়ার দেখেছি। কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব। বর্ষার পানিতে যে স্রোত; কেমন ঘূর্ণায়মান গোলা তৈরি হত। ইস্! ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। বর্ষাকালে নৌকায় চড়া। বিলে শাপলা তোলা। কলা গাছ দিয়ে ভেউরা তৈরি করা। বিচিত্র্য ধরণের মাছ ধরেছি। আর ছিল বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলা। আহা-রে! বর্ষার জোয়ারের পানি যখন খেলার স্থানগুলো একে একে তলিয়ে দিত। তখন কী যে মন খারাপ হত। সেই সময় নীচু জমিতে অল্প-বিস্তর পানিতে বৃষ্টিতে ভিজে মাঠ দাপিয়ে সে-কি ফুটবল খেলা। যে ফুটবল খেলতে পারে না সেও চলে আসতে হইচই আর উল্লাসের তাড়নায়। আর খুব ভালো লাগত, ঝুম বৃষ্টিতে পানিতে নেমে স্নান করা। বিশেষ করে যখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ত তখন পানি নীচে ডুব দিয়ে বৃষ্টির শব্দ শোনা। কী যে অদ্ভুত একটা শব্দ। এখনও কানে বাজে। ঝুম বৃষ্টিতে আর একটা কাজ করতাম, টিনের চালার ঘরের 'কারে' যেস্থানে ব্যবহার্য অতিরিক্ত জিনিস রাখার জায়গা। সেখানে উঠে বৃষ্টির শব্দ শোনতাম। টিনের চালায় বৃষ্টি আওয়াজ শুনে মনে হত বৃষ্টি বুঝি গায়েই পড়ছে। অথবা এই বুঝি পড়বে। বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খাওয়া। বন্ধুরা মিলে তাস খেলা। নৌকায় করে ঘুরতে যাওয়া। কলা গাছের ভেউরা বানানো। বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করা। আরও কত কী!

বর্ষায় বৃষ্টিভেজা মাঠঘাট। অবিরাম বর্ষণে ডুবুডুবু পুকুর-ডোবা-নদী-নালা। আর তখন নতুন পানিতে কই মাছ কাতরাতে কাতরাতে চলে আসত মাঠে কিংবা রাস্তায়। সেই কই মাছ ধরা। সে দারুণ এক রোমাঞ্চ। বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি আসলে মা একগাদা বকা দিতেন। তা অবশ্য সহজেই হজম করে নিতাম। কেননা বৃষ্টিতে ভেজার মজাই আলাদা। তবে বৃষ্টির পানিতে ভিজলে মা সবসময় বলতে, 'যাও তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও। না হলে সর্দি-জ্বর হবে।' তাই চটজলদি গায়ে পানি ঢেলে নিতাম। শরীরটা কাদাজল ধুঁয়ে ঝরঝরে হয়ে উঠত। এরপর যদি পেঁয়াজ-কাঁচা মরিচ আর সরষের তেলযোগে মুড়ি মাখা পেতাম। সে যে কী মজা, তা তো আর লিখলেই বোঝা যাবে না। নাকি! যেদিনগুলোতে অঝোড় ধারায় বৃষ্টি নামত। লোকজন বলত, 'আকাশ ফুটো হয়ে গেছে।' কেউ বলত, 'আকাশের এত দুঃখ জমেছে। যে সারাদিন চোখের পানি ফেলছে। তবুও ফুরায় না।' এসব দিনগুলোতে ঝুম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে স্কুলে গিয়ে দেখতাম, মোটে দশ-বারোজন এসেছে। ক্লাসে স্যার আসতেন আলসেমি নিয়ে। চলত গল্পগুজব। দেখা যেত, চারটা ক্লাস পরই ছুটি। তারপর আর কী? বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বইখাতা ভিজিয়ে বাড়ি ফেরা। আবার মায়ের বকাবকি। কতবার বলেছি বৃষ্টিতে ভিজবে না। আর ছাতা সঙ্গে থাকতে বৃষ্টিতে ভিজে যাও কিভাবে? আমরা জানি না কেমন করে ভিজে যাই। যাক সে কথা। তবে হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো শুরু হয়ে যেত। তখন মনে হত, কেন যে ব্যাঙ হয়ে জন্মালাম না! তারপর শুরু হত চুলার ধারে বইখাতা-জামাকাপড় শুকাতে দেওয়া। এভাবেই বর্ষার দিনগুলো নানা রঙে, নানা ঢঙে জীবনের সাথে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে। বৃষ্টির দিনে ঘরেই জমত খেলা। বৃষ্টির দিনে ক্যারাম, তাস, সাপলুডো, দাবা, কাগজে লিখে চোরপুলিশ, ষোলগুটি, অক্ষর দিয়ে (নাম-দেশ-ফুল-ফল-পশু) লিখে খেলার আনন্দে কেটে যেত সারাবেলা। বর্ষাকালে প্রতিদিন সকালে একটা কাজ ছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখতাম গতকাল থেকে আজকে বর্ষার পানি কতটা বেড়েছে। কোন কোন সময় যেন সহজে বোঝা তাই কাঠি দিয়ে চিহ্ন দিয়ে রাখতাম।

বর্ষাকাল মানে মেঘেদের ঘনঘটা। আকাশ যেন মেঘের চাদরে ঢাকা। মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে মেঘের আওয়াজ। ক্ষণেক্ষণে বৃষ্টি হওয়াতে একটু স্যাঁতস্যাঁতে ভাব। জামাকাপড় ভেজা। যখন খুব ছোট তখন বৃষ্টি মানে ছিল ছুটির দিন। সকালে বৃষ্টি দেখলেই মনে আনন্দ হত। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। সারাদিন ঘরে বসে খেলা আর দুপুরে ডিমভাজা আর খিচুড়ি খাওয়া। সে এক অন্য অনুভূতি। তারপর যখন ধীরে ধীরে বড় ক্লাসে উঠেছি তখন বৃষ্টি হলেও স্কুলে যেতে হত। পরীক্ষার জন্য বর্ষা নিয়ে রচনা মুখস্থ করতে হত। ইংরেজিতে 'এ রেনি ডে' কিংবা বাংলায় 'বর্ষণমুখর সন্ধ্যা'। বৃষ্টি মানেই সারাদিন ঘরে বন্দি আর ভাইবোনেরা মিলে সাপলুডু খেলা। যখন নবম-দশম শ্রেণীতে পড়ি তখন গৃহশিক্ষক বাড়িতে এসে আমাদের পড়াতেন। মাঝেমধ্যে সকাল থেকে আকাশভেঙ্গে বৃষ্টি নামত। পড়ার টেবিলে বসে মনে মনে চাইতাম আরও জোরে বৃষ্টি নামুক। স্যার যেন আজ আর না আসতে পারেন। কিন্তু শুকুনের দোয়ায় যে গরু মরে না। সেটাই সত্যি হত। স্যার আসার ঠিক আগে আগে বৃষ্টি থেমে যেত। আরও কষ্ট লাগত যখন স্যার এসে পৌছানোর পরে আবার জোরেসোরে বৃষ্টি নামত। তখন স্যার বলতেন, 'ভাগ্যিস ঠিকঠাক রওনা হয়েছিলাম। না, হলে যেমন বৃষ্টি হচ্ছে আজ আর আসতেই পারতাম না।' তখন কেমন লাগত!

পদ্মার ঘোলা পানি নদীতে ঢুকতে শুরু করলেই বোঝা যেত বর্ষা আসছে। বর্ষার ঘোলা পানি যখন নদীতে আসত তখন মানুষ বলাবলি করত, 'নদীর ঘোলা পানিতে এবার অনেক মাছ এসেছে।' তখনই মাছ ধরার সরঞ্জাম জোগাড় করতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ত। হাটে বাজারে বিভিন্ন ধরণের জাল, বড়শি. ছিপ, টেটা, চাঁই, ইত্যাদি। আমরাও তখন নিজেদের সাধ্যমত ব্যবস্থাপনায় মাছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতাম। কার থেকে কে বেশি মাছ ধরতে পারে। মাটি খুঁড়ে কেঁচো দিয়ে বড়শি গেঁথে কিংবা বড় মাছের আশায় টেটা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। অথবা কোথাও বর্ষার পানি ঢুকছে বা বেড়িয়ে যাওয়ার পথে জাল পেতে রাখতাম। সারাদিন বর্ষাকালের কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ততায় দিন কাটত। আমাদের নিজস্ব নৌকা ছিল না। কিন্তু বর্ষায় নৌকায় চড়া। সে এক স্বপ্নের মত মনে হত। যদি কোন ভাবে নোকায় চড়ার সুযোগ পেতাম। তাহলে আমায় আর পায় কে! কতসময় নিজের অদম্য ইচ্ছা পূরণে ঘাটে শিঁকল দিয়ে বাঁধা নৌকায় চড়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছি। বর্ষাকালের একটা বৈশিষ্ট্য আমার দারুণ লাগে। জোয়ারের পানিতে সব জায়গা সমান হয়ে যায়। বোঝা যায় না কোথায় উঁচু কোথায় নিচু। শুধু আগে থেকে জানা থাকলে একটা অনুমান করা যায় মাত্র। আর একটা বিষয় যেখানে পুকুর বা বড়দিঘি থাকে সেখানকার পানি অন্য জায়গার পানির থেকে বৈশিষ্ট্যগত ভাবে একটু আলাদা প্রকৃতির থাকত। তাই এ ধরণের পরিস্থিতির সামনে পড়লে আমরা বিজ্ঞের মত বলতাম 'এখানে পুকুর আছে।' বর্ষার দিনে নৌকা বাইচের তুলনা নাই। নৌকা বাইচ মানে বিশাল আয়োজন।

আমাদের বাড়ীর পিছনে বড়সড় বাঁশঝাড় ছিল। বাড়ির ভিটে থেকে বাঁশঝাড় কিছুটা নিচু এবং জায়গাটা ছিল সমতল। বাঁশঝাড়ের পরেই ছিল বিশাল খাল। তাই বর্ষার জোয়ারের পানিতে খাল ভরে উঠলে এমনিতেই বাঁশঝাড়ের ভেতর পানি ঢুকে পড়ত। তখন মনের মধ্যে অন্যরকম এক আবেশ তৈরি হত। প্রতিদিন অল্প অল্প করে পানি এসে ভেসে যেত পুরো বাঁশতলাটা। কী পরিষ্কার পানি ছিল। পানির সাথে মাছও আসত। বিশেষ করে অল্প পানিতে আসত 'রাঘাটাকি'। যাকে আমরা বলতাম 'উগলাটাকি'। সে সময় 'রাঘাটাকি' কেউ খেত না। অনেকে 'রাঘাটাকি' ধরে বোয়াল মাছ ধরার আধার দিত। সেই অল্প পানিতে মাছেদের বিচরণ দেখতে অদ্ভুত লাগত। এতকাছ থেকে আমরা তাদের দেখতাম কিন্তু মাছগুলো আমাদের দেখে ভয় পেত না। বড়শি ফেললেই টুপ করে গিলে ফেলতো। অন্যান্য মাছ যেমন চালাক। সেই 'রাঘাটাকি' তেমন চালক ছিল না। সত্যি স্মৃতিময় সেই বর্ষা মৌসুমের দিনযাপন।

বর্ষা মানে বৃষ্টি। বৃষ্টি মানে ছাতা। আর ছাতা মানেই হারানোর বেদনা। তাই তো বর্ষার বৃষ্টিতে কত স্মৃতি মনের পাতায় ভাসে। কতকথা বুকের ভেতর বিষণ্নতার চাদরে ঢাকা পড়ে আছে। বন্ধদুয়ার জানালা দিয়ে দু'চোখ খোঁজে তেপান্তরের। তখন এমনিতেই পুকুরে কিংবা নদীতে স্নান করতাম। আর বর্ষা এলে বর্ষার পানিতে ডুব দেওয়া অর্থাৎ স্নান করা মানে ঘন্টাখানেকের ব্যাপার-স্যাপার। কখনও খালের পানিতে। কখনও বিলের (চকের) পানিতে। আমরা দলবেঁধে ডুবিয়েই চলতাম। বেশি সময় ধরে ডুব দেওয়ার কারণে চোখ থাকত লাল। আর মায়ের কান মলা খেয়ে কান হত লাল। তবু কখনো কোন নিষধ-ই কাজ হয়নি। ঠিক-ই দুপুরের আগে নেমে পড়তাম বর্ষার পানিতে। পানিতে নেমে তো শুধু স্নান করা না। ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা। ডুব সাঁতার দেওয়া। উল্টো সাঁতার দেওয়া। লুকোচুরি খেলা। গাছের বা ব্রীজের ওপর থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়া। নৌকাযোগে বিলে গিয়ে সাঁতার কাটা। আরও কত কী যে ছিল! বৃষ্টির জমে থাকা পানিতে কাগজের নৌকার বাইচ দেওয়া। জমে থাকা কচুপাতার পানি নিয়ে দুষ্টামি করা। কাদায় মাখামাখি করা। ব্যাঙ মেরে খাওয়া। এতকিছুর মধ্যে মাঝে সাঝে জ্বর, সর্দি, কাশি, ইনফেকশন যে হত না তা কিন্তু না। কিন্তু কিছুই বেশিদিন থাকত না। বর্ষার পানির মত সব ধুয়ে মুছে চলে যেত। সে সব খেলার দিন আর ছোট ছোট বিষয়ে আনন্দ পাওয়া আজ ইতিহাসে মুখ গুঁজেছে।

বর্ষা মানে বাহারি রঙের সুগন্ধি ফলের সমাহার। বর্ষা যেন আমাদের প্রকৃতিকে আপন হাতে সাজিয়ে দেয়। বর্ষার ফুলের সৌন্দর্য আমাদের করে তোলে বিমোহিত। বর্ষাকালের বিশেষ কিছু ফুল ফুটে। এরমধ্যে অন্যতম কদম ফুল। গাছ ভর্তি কদম ফুল দূর থেকে দেখলেই মনটা জুড়িয়ে যায়। বর্ষার নানারকম ফুলের মধ্যে আছে- শাপলা, কদম, কলাবতী, কেয়া, পদ্ম, দোলনচাঁপা, কলমি ফুল, উলটকম্বল, কামিনী, রঙ্গন, বকুল। এছাড়াও এই সময়ে নানা রঙের অর্কিড ফুটতে দেখা যায়। বর্ষা ঋতু যেন ফুলের জননী। বর্ষা এবং বৃষ্টি নিয়ে বেশকিছু ভালো লাগার গান রয়েছে। গানগুলো শুনলে বর্ষার স্মৃতিময় দিনের আবেশ পাওয়া যায়। একই সাথে মিলে বর্ষার আবহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষার গান শুনলেই হৃদয়ে স্পন্দন জেগে উঠে। বৃষ্টির ফোঁটা ঝরলেই আমরা গাইতে থাকি- 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদলদিনে জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন মন লাগে না।' কিংবা 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়, এমন দিনে মন খোলা যায়। আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে, দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে, মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিক-দিগন্তের পানে।' অথবা বৃষ্টির ছোঁয়ায় হৃদয় যখন আনন্দে নেচে উঠে তখন গাইতে চায় মন 'এই ঘেমলা দিনে একলা, ঘরে থাকে নাতো মন। কবে যাবো কবে পাবো, ও গো তোমার নিমন্ত্রণ।' আর যখন মন উতলা হয়ে উঠত তখন 'পাগলা হাওয়া বাদল দিনে, পাগল আমার মন জেগে ওঠে' এরকম গান শুনলে কখন কণ্ঠে বেজে ওঠত, 'আকাশ এতো মেঘলা যেও নাকো একলা। কিংবা নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরীর 'আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে মনে পড়ল তোমায়।'

এখন পরিবেশ পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। আমরাও সাথে সাথে বদলে গেছি। বৃষ্টি হলে চাইলেও ভিজতে পারি না। তবুও মনে মনে ভিজে যাই স্মৃতির বর্ষা বরণে। মেঘের সঙ্গে সঙ্গে মনে জমানো অভিমান আর বিচ্ছেদের মনখারাপেরা গলে গলে পড়ে। যান্ত্রিক সব সমীকরণকে ছাপিয়ে গিয়ে মেঘমাল্লার ডাক শোনা যায়। কান পাতলে শোনা যায় নিত্যকালের প্রিয়জনের চপল অভিসারের আওয়াজ। একটানা ঝিঁঝি আর ব্যাঙের ডাকের কনসার্টে নিভু আলোয় বাড়ি ফেরার রাস্তায় আচমকা মনে পড়ে বর্ষাদিনের ফেলে আসা গল্পগুলো। তখন জলছবির মতো দেখতে পাওয়া সন্ধ্যার আকাশের সব মেঘেরা হয়ে যায় এক একটা রূপকথার কল্পগাঁথা। জীবন চরিত্রের সেই সব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে জমাটি সেই আড্ডা। আর গল্পে ভরা সেই রূপকথা। বন্ধুরা সবাই মিলে দেখা হয় না অঝোর বৃষ্টির কান্না বা কোথাও দলবেঁধে ঘুরতে যাওয়া। বর্ষা ঋতু এবার আসুক স্বপ্নের কারবারি হয়ে। মেঘের ডাকাডাকিতে ঘুম-ভাঙানিয়া ভোর আসুক। বৃষ্টির তরে সেরে উঠুক ব্যস্ততার জীবন। মাটির সোঁদা গন্ধ প্রাণে-প্রাণে ছড়িয়ে পড়ুক। পুরোনো দিনের সেই বর্ষা মাতিয়ে তুলুক আধুনিক যান্ত্রিকতার ভরা জীবনটাকে॥

বিদায়ের দ্বিতীয় বর্ষ

প্রয়াত যোসেফ রঞ্জন গমেজ
জন্ম: ১২ আগস্ট, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী।

প্রিয় বাবা

দেখতে দেখতে তুমি হীনা দুটি বছর কেটে গেল। ভাবতেই কষ্ট হয় তুমি আর আমাদের মাঝে নেই। তোমার উপস্থিতি, তোমার স্পর্শ, নাম ধরে ডাকা, শাসণ ভীষণ ভাবে অনুভব করি বাবা। শত প্রতিকূলতার মধ্যে ও পরিবারকে কোন কিছুর অভাবে পড়তে দেওনি কখনো, সর্বদা আগলে রেখেছো আমাদের। তুমিহীন দুটি বছরেই আমরা হাপিয়ে উঠেছি বাবা। জানি একদিন আমাদের সবাইকেই চলে যেতে হবে, কিন্তু তোমার এই অকাল চলে যাওয়াটা বড় তাড়াতাড়া হয়ে গেল বাবা। তোমার আদরের নাতি নাতনিরাও তোমাকে খুঁজে ফিরে সবসময়। জানি তোমার শরীরি উপস্থিতি আর পাবো না কিন্তু তোমার আদর্শ, নীতি আমাদের পথ চলার পাথেও। তোমাকে ছাড়া মা যেন দিশাহীন, তোমাকে খুঁজে ফেরে সারাক্ষণ। জানি তুমি স্বর্গস্থ পিতার আশ্রয়ে আছো। তুমি স্বর্গ হতে আমাদের আশীর্বাদ করো আমরা যেন তোমার নীতি আদর্শে পথ চলতে পারি।

তোমার ভালোবাসার
ছেলে : বাপ্পি গমেজ, **মেয়ে :** রীমা গমেজ
ছেলে বৌ : সুরভী রড্রিক্স, **জামাতা:** সুব্রত রোজারিও
নাতী-নাতনী: নিলান্ত, নিলাদ্রী ও আয়ুশি
স্ত্রী : রানু রোজলিন গমেজ

বিজ্ঞ/১৮৫/২১

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

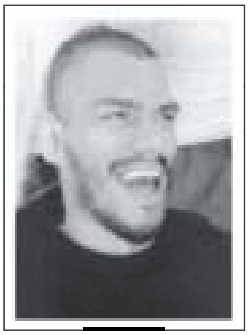

প্রয়াত রোমেল ভিন্সেন্ট রোজারিও
জন্ম : ৫ মে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় রোমেল,

দিন পেরিয়ে আজ একটি বছর হয়ে গেলো তুমি এই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছ। তুমি ছিলে আমাদের পরিবারে আর্শীবাদ-স্বরুপ। দীর্ঘ তেতাল্লিশটি বছর অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছো যিশুর ক্রুশীয় যন্ত্রণার মতো। তুমি ছিলে শান্ত ও নিস্পাপ শিশুর মতো। তুমি চলে গিয়েও আমাদের হৃদয়জুড়ে আছো প্রতি মুহূর্তে এবং রয়ে যাবে স্মৃতির পাতায় অমলিনভাবে। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে তোমার সাথে জীবন শেষে স্বর্গরাজ্যে মিলিত হতে পারি। প্রভু তোমার আত্মাকে চির শান্তি দান করুন ।

নমিতা রেবেকা রোজারিও
ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১৮৩/২১

রাজার সিংহাসন

পার্নিল এ গমেজ

রাজার আসন রাজার মতই হওয়া উচিত। মোঘলদের সেই ময়ূর সিংহাসন আর নেই। জার সম্রাটদের সেই রত্ন ভান্ডার নেই। সেই মোঘলও নেই, সেই জারও নেই, কোথায় গেল সব? তবে হ্যাঁ এককালে ছিল সব। মোঘলরা ছিল, ছিল তাদের সান শওকত আর ময়ূর সিংহাসন। জাগতিক বিষয় জগতেই শেষ হতে থাকে। অনেকটা আলাদিনের প্রদীপের মত। দৈত্য তুমি কার? প্রদীপ হাতে যার । হাত বদলায়, সময়ের পরিবর্তনে স্থানও বদলায়। জগতের যে কোন বিষয়কে কিছুক্ষণের জন্য আপন করা যায় বটে, কিন্তু সেটা কতক্ষণ আমার বা তোমার থাকবে, তার কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। এই আছে আবার এই নেই। ঈশ্বর মানুষকে সবকিছু দিয়েছেন, কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে, সে কোনটিকে গ্রহণ করবে আবার কোনটিকে গ্রহণ করবে না। সেটা মানুষ নিজেরা ঠিক করবে। জগতের সকল জীবজন্তু থেকে মানুষ বেশ আলাদা। দাউদ খাঁ, হালাকু খাঁ, চেঙ্গিস খাঁ এদের আজও মানুষ স্মরণ করে, কিন্তু শ্রদ্ধা করে নয়। অনেক বীর যোদ্ধা ইতিহাসের পাতা দখল করে বসে আছে কিন্তু মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে অন্য দৃষ্টিতে। তাদের কেউ মানুষের মনকে বা অন্তর জগতকে অধিকার করতে পারেনি। অথচ যিশু কাঠ মিস্ত্রির ঘরে জন্ম নিয়েও সমগ্র মানুষের অন্তরে বন্দিত। হযরত মুহম্মদ, বুদ্ধদেব, জৈনবীর এরা সকলেই মানুষের অন্তরকে জয় করেছেন। পৃথিবীর সকল মানুষ আজও তাদের মনে করে এবং তাদের নির্দেশিত পথে চলতে চায়। যে জাত প্যটনী হয় তার তুফানে কি ভয়? যিনি সত্যিকারের রাজা তাকে পরিচিতির জন্য বিশেষ কিছু পরিধান করতে হয় না। যিশুকে বলা হয়েছে রাখাল-রাজা, সত্যিই কি তাই? রাখালরা যিশুকে রাজা হিসেবে প্রণামী দিয়েছিলেন, তাই তিনি রাখাল রাজা। তিনি হলেন রাজাদের রাজা। পৃথিবীর শেষ দিনে মানবের বিচার করতে তিনিই আসবেন। পৃথিবীর সকল রাজা-মহারাজার বিচার তিনিই করবেন। আর এই বিচার সিংহ রাজার বা মোঘল সম্রাটদের রাজাদের মত নয়। বরং মেষশাবকের মত নম্র হয়ে তিনি বিচার করবেন। তাঁর আসন সোনা বা মুক্তা বা ময়ূরের পেখম দিয়ে হবে না। তার আসন হবে আমাদের সকলের অন্তরে। তিনি চান, আমরা যেন আমাদের হৃদয়কে তার সিংহাসন করে তুলি। যার মধ্যে থাকবে ভালবাসা, দয়া, নম্রতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, সেবা, বিশ্বস এবং পবিত্রতা।

সারসংক্ষেপ : এই ছোট গল্পটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, "আমরা যদি আমাদের হৃদয়ের সিংহাসন ঠিক না রাখি, তাহলে, খ্রিস্ট রাজা আসার পূর্বে আমরা যতই সাজ-স্বজ্জা করি না কেন, স্বর্ণ, মনি-মুক্তা দিয়ে আসন তৈরি করি না কেন, তাঁর কোনো মূল্যই থাকবে না।"

রোদেলা ম্যাগডালিনা গমেজ
চতুর্থ শ্রেণি

বর্ষা

ইভেট মিথিলা নাথানিয়েল

প্রিয়বর্ষা, আজ তোমার কাছে আকুল আবেদন,
এসো তুমি ধারায়, তোমার পরশে ভরিয়ে দাও আমার পিপাসিত মন।
রোদের এতাপে শুষ্ক আজ ভূমি, শুষ্ক আমার মন,
শুষ্ক এধারায় আসবেকি তুমি,
রাখবে এ নিমন্ত্রণ

বেলী, বকুল, কদমের সুগন্ধে ভরবে কি এই পথ প্রান্তর?
কৃষ্ণচূড়ার গাড় লাল রঙে সুরভিত হবে কি এই অন্তর?
বকুলের মালা গাঁথব আমি খোপায় পড়ব বলে,
কদম হাতে ভিজবে কিশোরী তুমি আসবে বলে।
চোখ রাঙাবেকি কচুরির ফুল
জল থৈ থৈ পুকুরে?
ছাতি মাথায় হাটব আমি রাস্তায়,
মাঠে, প্রাচীরে?
গাছের পাতায় ময়লা জমেছে তোমাকে ভীষণ দরকার,
এসোগো বর্ষা, এসোগো তাড়াতাড়ি
এ সবার আবদার।
ছোট বাচ্চারা মাছ ধরবে বলে বসে আছে তোমার প্রতিক্ষায়,
ময়ূরের মন ভীষণ খারাপ,
তোমার দীর্ঘ অপেক্ষায়।

আমার প্রিয়তম অপেক্ষা করছে তুমি আসবে বলে,
হাত ধরে ভিজব দুজনে গানের সুরে তালে।
বন্ধুবর্ষা, অভিমান করেছ কি?
ভুলে যাও আজ অভিমান,
শুষ্ক ধারায় এসো তুমি আজ,
ভরিয়ে দাও মন প্রাণ॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ঈশ্বর তাঁর দূতবাহিনীকে তোমাদের সান্ত্বনা দিতে প্রেরণ করেন

- বয়স্কদের প্রতি পোপ ফ্রান্সিস

গত ১৮ জুন পোপ ফ্রান্সিস ১ম বিশ্ব পিতামহ-পিতামহী ও বয়স্ক দিবস উপলক্ষে এক বার্তা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য বিশ্ব পিতামহ-পিতামহী দিবস সাধু যোয়াকীম ও সাধ্বী আন্নার স্মরণ দিবসের কাছাকাছি রবিবারে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের মতো এ বছর তা পালন শুরু হবে ২৫ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এই দিবসের উদ্বোধন উপলক্ষে বার্তার মূলভাব নেওয়া হয়েছে মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের ২৮ অধ্যায়ের ৩০ পদ থেকে : 'আমি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে আছি।' পিতামহ/মহীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে পোপ মহোদয় বলেন, স্বর্গে যাবার আগে যিশু তাঁর শিষ্যদের কাছে এ কথা বলেছিলেন। প্রত্যেকজন বয়স্ক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, সমগ্র মণ্ডলী আপনাদের ও আমাদের পাশেই আছে - আপনাকে যত্ন নেন, ভালবাসেন এবং কখনো একাকী রাখতে চান না।

পোপ মহোদয়ের বার্তাটি করোনা মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার এমন এক সময়ে এসেছে যখন তা সবাইকে বিশেষভাবে বয়স্কদের আক্রান্ত করছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, অনেকেই অসুস্থ, কেউ কেউ মারা গেছেন আবার কেউ কেউ স্বামী/স্ত্রীর বা প্রিয়জনের মৃত্যু অভিজ্ঞতা করেছে, আবার কেউ কেউ নিজেকে দীর্ঘ সময় ধরে একাকী করে রেখেছে। তিনি বলেন, আমরা যা অভিজ্ঞতা করছি ঈশ্বর তা ভালো করে জানেন। যারা একাকীত্বে আছেন, বিশেষভাবে এই মহামারীর সময়ে ঈশ্বর আরো ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সাথে আছেন। জীবনের গভীর অন্ধকার সময়েও ঈশ্বর তাঁর দূতদের প্রেরণ করেন আমাদেরকে শক্তি-সান্ত্বনা দান করতে যাতে করে আমরা বুঝতে পারি তিনি সবসময় আমাদের সাথে আছেন। স্বর্গদূতেরা কখনও নাতি-নাতনিদেও মধ্যদিয়ে, কখনো পরিবারের সদস্যদের মধ্যদিয়ে কখনো আবার জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথের বন্ধুদের মধ্যদিয়েও আসেন। ঈশ্বর তাঁর বাণীর মধ্যদিয়েও আমাদের মাঝে আসেন। তাই প্রতিদিন মঙ্গলসমাচারের কিছু অংশ পাঠ করতে, সামসঙ্গীত প্রার্থনা করতে বয়স্কদের প্রতি অনুরোধ রাখেন পোপ মহোদয়। নিজেদের শিকড়কে সংরক্ষণ করা, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশ্বাস দান করা এবং ছোটদের যত্ন নেওয়া বয়স্কদের আহ্বান বলে মত প্রকাশ করেন পোপ মহোদয়। প্রথমবারের মতো বিশ্ব পিতামহ/মহী ও বয়স্ক দিবস পালন উপলক্ষে তাদের প্রতি আরো বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা জাগ্রত করার লক্ষে পোপ মহোদয় বিশেষ দণ্ডমোচনের ঘোষণা দিয়েছেন। তা পেতে হলে ২৫ জুলাই পোপ মহোদয়ের পৌরহিত্যের খ্রিস্টযাগে সরাসরি বা ভার্চুয়ালি অংশ নিতে হবে, পরবর্তী দ্রুত সময়ে সাক্রামেন্তীয় পাপস্বীকার এবং দয়ার কাজ করতে হবে। খ্রিস্টভক্তগণ পর্যাপ্ত সময় একজন বয়স্ক ব্যক্তির পাশে থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দয়ার কাজ করতে পারেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va, এপি*

পোপ মহোদয়ের সাথে স্পাইডারম্যান খ্যাত ব্যক্তির সাক্ষাৎ

গতকাল ১৯ জুন রোজ বুধবার পোপ ফ্রান্সিস যখন ভাতিকানে জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলেন, আচমকাই তার দৃষ্টি কেড়ে নেয় কমিকবুক ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় সুপারহিরো চরিত্র স্পাইডারম্যান! আসলে ওই সুপারহিরোর কস্টিউমে হাজির হয়েছিলেন ২৮ বছর বয়সী ইতালিয়ান তরুণ মাত্তেও ভিল্লারদিতা।

গরম আবহাওয়ার মধ্যেও এমন পোশাক পরে পোপের সঙ্গে দেখা করার কারণ হিসেবে ওই তরুণ জানান, তিনি নিজের সন্তান ও পরিবারের জন্য পোপ মহোদয়ের কাছে প্রার্থনা চেয়েছেন। পোপ তাকে নিরাশ করেননি। মিলিয়েছেন হাত। পোপ মহোদয়েকে মাত্তেও একটা মাস্ক উপহার দেন ভিল্লারদিতা। ভিল্লারদিতা বলেন, পোপ মুহূর্তেই আমার উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছিলেন বলে ভীষণ রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছিলাম আমি।

এরপর উপস্থিত তরুণ ও শিশুদের সঙ্গে সেলফি তুলে মুহূর্তগুলোকে নিজের জন্য স্মরণীয় করে রাখেন ওই তরুণ। এদিকে, ভাতিকান কর্তৃপক্ষ ভিল্লারদিতাকে একজন সত্যিকারের ভালো সুপারহিরো বলে অভিহিত করেছে। কেননা, ইতালিজুড়ে মাসের পর মাস ধরে চলা করোনাভাইরাসের প্রকোপকালে তিনি ১ হাজার ৪০০-এরও বেশি ভিডিওকলের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের মনে সাহস ও মুখে হাসি জুগিয়েছেন।

গ্রাম বাংলার সংবাদ

মিরপুর ধর্মপল্লীতে প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও ▯ বিগত ২৮ মে রোজ শুক্রবার মিরপুর ধর্মপল্লীতে প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন ঢাকা মহধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। সকাল ৯টায় প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ প্রার্থীদের শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কারের তাৎপর্য নিজের জীবন অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন উদাহরনের মধ্য দিয়ে শিশুদের কাছে এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। উপদেশের পরে প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারী প্রার্থীগণ শয়তানকে পরিত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাস নবায়ন করে। এরপর আর্চবিশপ হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন এবং উৎসর্গের পর প্রথম কম্যুনিয়ন প্রদান করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান, সেই সাথে আর্চবিশপসহ, এনিমেটর, প্রার্থীদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন,তাদের শিক্ষাদানকারী ফাদার, সিস্টার, এনিমেটরদের, পালকীয় পরিষদ, উপাসনা কমিটি, গানের দলসহ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর দলীয় ছবি তোলা হয় এবং প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারীদের মাঝে উপহার, সার্টিফিকেট ও টিফিন বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ৩৯ ১ম কম্যুনিয়ন প্রার্থী এবং ২৯জন হস্তার্পণ প্রার্থী, মোট ৬৮জন সংস্কার গ্রহণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত টি. রিবেরু, ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, ফাদার সমীর রোজারিও, ১৮জন সিস্টারসহ প্রায় ৪১১জন খ্রিস্টভক্ত ছিলেন॥

ঢাকা ও ময়মনসিংহে খ্রিস্টান সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ বিগত ১৮-১৯ জুন, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে, ভাদুন পবিত্র ক্রুশ পালকীয় কেন্দ্রে বিশপীয় খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের অধিনে "খ্রিস্টান সংগঠন বিষয়ক দপ্তর" ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ "শান্তি স্থাপনে ও টেকসই উন্নয়নে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ" এই মূলসুরের আলোকে খ্রিস্টান সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দদের জন্য এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। সকাল ০৯:১৫ মিনিটে সিস্টার বৃজিতা এসএমআরএ এর প্রার্থনা পরিচালনার মধ্যদিয়ে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মশালার শুরুতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের লেইটি কমিশনের আহ্বায়ক ফাদার অমল ডি'ক্রুজ সকলের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ বিষয়ক বিশপীয় কমিশনের সেক্রেটারী থিওফিল নকরেক এই প্রশিক্ষণের শুভ কামনা করে ও অংশগ্রহণকারী সবার মঙ্গল কামনা করে "খ্রিস্টান সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা"– ২০২১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

"খ্রিস্টান সংগঠন বিষয়ক দপ্তর" এর আহ্বায়ক রেবেকা কুইয়া প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন খ্রিস্টমণ্ডলীতে শান্তি স্থাপনে ও মণ্ডলীর প্রতিটি কার্যক্রমে ভক্তজনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, মান্ডলীক শিক্ষা, গঠন, আহ্বান, মর্যাদা অবস্থান, দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দান করাই হচ্ছে এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন তুমিলিয়া, নাগরী, মঠবাড়ি, রাঙ্গামাটিয়া, দড়িপাড়া, ভাদুন, ধরেন্ডা, পাগাড় ও মাউসাইদ ধর্মপল্লী থেকে মোট ৫৭ জন খ্রিস্টভক্ত, ১জন ফাদার এবং ৪জন সিস্টার। অংশগ্রহণকারীগণ সবাই মণ্ডলীর কাজে জড়িত। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপনা, মূল্যায়ন ও দলীয় আলোচনার দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে শিখা রানী হালসনা, রিতা রোজলিন কস্তা, পাপীয়া রিবেরু, সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ ও প্যাট্রিক দৃশ্য পিউরিফীকেশন।

প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে সহভাগিতা করেন রেবেকা কুইয়া, থিওফিল নকরেক, কারিতাস বাংলাদেশের অর্থ ও প্রশাসন পরিচালক সেবাস্টিয়ান রোজারিও, ফাদার অমল ডি' ক্রুজ, দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ চেয়ারম্যান এর পঙ্কজ গিলবার্ট কস্তা, বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও, কালিগঞ্জ উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মিস শর্মিলা রোজারিও।

এদিকে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের আয়োজনে বিগত ১১-১২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে একই বিষয়র উপর প্রশিক্ষণ হয় ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীর মিলনায়তনে। সকাল ৮:৩০ মিনিটে সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ এর প্রারম্ভিক প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই প্রশিক্ষণ এর যাত্রা শুরু। কর্মশালার শুরুতে উক্ত ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রবেশ রাংসা সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ভালুকাপাড়া ও ধাইরপাড়া ধর্মপল্লী থেকে মোট ৫৪ জন খ্রিস্টভক্ত।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ে সহভাগিতা রাখেন ভালুকাপাড়া ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার অঞ্জন জাম্বিল, রেবেকা কুইয়া, থিওফিল নকরেক, ফাদার প্রবেশ রাংসা, ক্লেমেন্ট চিসিম, সূচিত্রা স্কু ও কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক অপূর্ব ম্রং।

প্রশিক্ষণের শেষাংশে সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। তিনি বলেন, ঈশ্বর কখনো প্রতিবন্ধি হন না বা অচল হন না। তিনি চির জীবন্ত। বিশপ তার উপদেশের মধ্যদিয়ে ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ তবে বিশেষভাবে ভক্ত জনসাধারণের প্রৈরিতিক কার্যাবলী– এই ডিক্রীর উপর আলোকপাত করেন।

উল্লেখ্য প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যে যে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে তা হল : "শান্তি স্থাপনে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ", "সামাজিক কার্যক্রমে আর্থিক ব্যবস্থাপনা" (বাগদান, বিবাহ, গায়ে হলুদ, অভিষেক, শ্রাদ্ধ, চল্লিশা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সাক্রামেন্তীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি), "টেকসই উন্নয়নে খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ" (এসডিজি-আলোকে), প্যানেল আলোচনা, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি।

খ্রিস্টান সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে এর আলোকে "শান্তি স্থাপন ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে" একজন দলনেতা হিসাবে পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে যা যা করবে বলে অংশগ্রহণকারীগণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা হল খ্রিস্টীয় আদর্শে সবাইকে ভালবেসে মণ্ডলীতে ও সমাজের দায়িত্ব পালন, সৎসাহসী, সৃজনশীল, নীতিবান, দায়িত্বশীল, বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে পরস্পরকে সহযোগিতা এবং সমান অধিকার প্রদান, সঠিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান, ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্বি, ক্ষমতা হস্তান্তরের মনোভাব তৈরি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো, ধর্মপরায়ণ, আত্মবিশ্বাস, ক্ষমাশীল আচরণ, ক্ষমতার সদ্ব্যবহার, আত্মত্যাগ ও সেবামূলক মনোভাব তৈরী, সৃষ্টিকর্তা, ভাইমানুষ ও প্রকৃতির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, রাগের বশে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, নারী পুরুষের সমান অধিকার রক্ষা করা, দানশীল ও পরোপকারী হওয়া এবং সকলের প্রতি সম দৃষ্টিভঙ্গি আনয়ন করার জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

প্রশিক্ষণগুলো শেষে কমিশনের সেক্রেটারী থিওফিল নকরেক সবার আন্তরিক ও সহযোগিতাপূর্ণ অংশগ্রহণ পূর্বক কর্মশালাগুলোকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রশিক্ষণ কর্মশালা সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অংশগ্রহণকারীগণ *ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের অংশগ্রহণকারীগণ*

গৌরনদী ধর্মপল্লীতে সম্প্রীতি দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন

ডিকন সৈকত লরেন্স বিশ্বাস ▯ "ভ্রাতৃত্বে সম্প্রীতি : আমরা সবাই ভাই" উক্ত মূলভাবের আলোকে গত ২৫ জুন রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় গৌরনদী ধর্মপল্লীতে সম্প্রীতি দিবস-২০২১ পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০জন বিভিন্ন ধর্মের ভাই-বোন অংশগ্রহণ করেন, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পালপুরোহিত ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল নিমন্ত্রিত অতিথীদের আসন গ্রহণ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, কোরান তেলোয়াত, গীতা পাঠ এবং বাইবেল পাঠ এবং বরণ নৃত্য ও ফুল দিয়ে অতিথীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। পাল-পুরোহিত ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এবং সেই সাথে সম্প্রীতি দিবস-২০২১ এর আলাচনা সভার শুভ উদ্বোধোন ঘোষণা করেন। মূলভাবের উপর তিন ধর্মের আলোকে আলোচনা। উক্ত আলোচনায় মূলভাবের উপর খ্রিস্ট ধর্মের আলোকে সহভাগিতা করেন যোয়াকিম মান্না বালা (সম্বনয়কারী আন্তধর্মীয় সংলাপ কমিশন, বরিশাল কাথলিক ধর্মপ্রদেশ), হিন্দু ধর্মের আলোকে সহভাগিতা করেন বাবু শক্তি বিশ্বাস (সহকারী শিক্ষক সরকারি গৌরনদী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়), এবং ইসলাম ধর্মের আলোকে সহভাগিতা করেন মো: এইচএম ইলিয়াস (সিনিয়র শিক্ষক পালরদী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ)। তিন ধর্মের আলোকে সহভাগিতার পরপরই ছিল মূলভাবের উপর উন্মুক্ত আলোচনা এবং সার্বজনীন প্রার্থনা। অনুষ্ঠানের শেষে পালপুরোহিত ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ শেষ প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং পরে সকলের জন্য দুপুরের আাহার প্রদান করা হয়॥

রাঙ্গামাটিয়া গির্জার প্রতিপালক পবিত্র যিশু হৃদয়ের পার্বণ উদ্‌যাপন

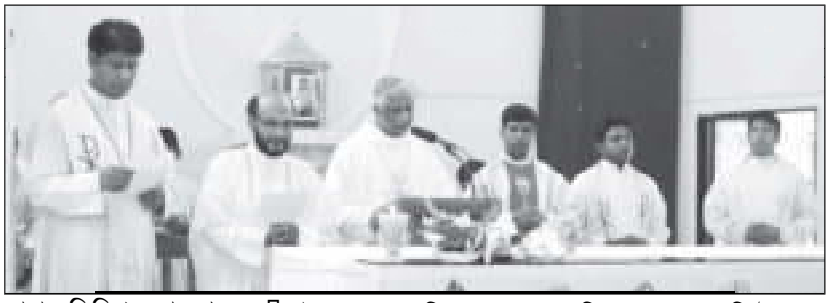

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ ▯ গত ১১ জুন ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার, রাঙ্গামাটিয়া গির্জার প্রতিপালক পবিত্র যিশু হৃদয়ের পার্বণ সীমিত পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ নয়দিনব্যাপী নভেনা ও প্রার্থনা করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় পবিত্র যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা, ক্ষমা ও মিলনের বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি আরও বলেন, পবিত্র যিশু হৃদয় আমাদের একান্ত আহ্বান জানায়, আমরা যেন তাঁর ভালোবাসার আশ্রয়ে থাকি। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে পবিত্র যিশু হৃদয়ের ভালোবাসা পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করি। যেন আমরা মিলন সমাজ গড়ে তুলতে পারি। এরপর বিশপ মহোদয় রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর নব-নির্বাচিত পালকীয় পরিষদের সদস্যদের শপথ পাঠ করান। খ্রিস্টযাগ শেষে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ'কে সিলেট ধর্মপ্রদেশের নতুন বিশপ হিসেবে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এবং একই সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে স্থানীয় ফাদারগণ অংশগ্রহণ করেন। নয়দিনের নভেনায় এবং পর্বীয় খ্রিস্টযাগে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের জন্য রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ভিন্‌সেন্ট খোকন গমেজ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

ভাতিকান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর উদ্যোগে এক বিশেষ ভিডিও কনফারেন্স

লিলি এ গমেজ ▯ মেডিক্যাল/স্বাস্থ্য এবং প্রৈরিতিক কর্মীগণ যারা করোনা রোগীদের অসুস্থতাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের কি ধরনের প্রয়োজন এবং প্রত্যাশা আছে, তারা কী ধরনের অভিজ্ঞতা, এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন তা সহভাগিতা করার জন্য দি ডাইকাসট্রি ফর প্রমোটিং ইন্ট্রিগ্র্যাল হিউম্যান ডেভপমেন্ট বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করে। ৮ জুন ইউরোপ মহাদেশের জন্য, ৯ জুন আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এবং ১০ জুন ২০২১ এশিয়া ও ওশেনিয়া মহাদেশের জন্য। এই কনফারেন্স এর সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন মুন্সিনিওয়র চার্লেজ নেমুগেরা, ডিরেক্টর, অব *দি ডাইকাসট্রি ফর প্রমোটিং ইন্ট্রিগ্র্যাল হিউম্যান ডিভপমেন্ট*, ভাতিকান সিটি। এই কনফারেন্সে রিসোর্স পারসন হিসেবে বাংলাদেশ থেকে নার্স হিসেবে সিস্টার সবিতা গ্লোরিয়া এসসি এবং ড: ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তাকে নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে ৯ জন এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দেশের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজন, চ্যালেঞ্জ এবং বেশ কিছু সাক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে। কনফারেন্সের গুরুত্ব হলো -স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা বিশেষভাবে করোনাকালে নিজের দুঃখ, অর্থনৈতিক কষ্ট, অসুস্থ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি, থাকা সত্বেও মানুষের জীবনের সেবক-সেবিকা হিসেবে এবং মানুষের আত্মিক, দৈহিক ও মানসিক নিরাময়ের জন্য কাজ করছেন। তাদের ভিতর অনেক ভয়, মানসিক চাপ, পারিবারিক ও সামাজিক চাপ, একাকীত্ব, অনেক সময় কাজের অতিরিক্ত চাপ তাদেরকে আরো কষ্টের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য তাদের সহচরী হয়ে তাদের সাথে কাজ করা দরকার। তারা যে ধরনের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন তা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি তা পথ খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের চাপ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে॥

শুলপুর ধর্মপল্লীতে বিশপ যোয়াকিম রোজারিও এর ২৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

শংকর পল রোজারিও ▯ গত ৯ জুন প্রয়াত বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি এর ২৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগের প্রাক্কালে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিমের ছবি, মালা, ধূপ সহকারে শোভাযাত্রা করা হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে সকাল ৬:৩০ মিনিট ভোরের খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিন্টু এফ. কস্তা। তিনি তার উপদেশ বাণীতে বিশপ যোয়াকিম রোজারিও-এর বিভিন্ন গুণাবলী সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে উপস্থিত সকলকে এসবিএম-এর সৌজন্যে মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়॥

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.1978

তারিখ : ২৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঋণের কিস্তি, সুদ ও জরিমানা এবং স্কিম জমা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা 'দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ' এর সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১ জুলাই, ২০২১ তারিখ** থেকে সোসাইটি হতে গৃহীত সকল প্রকার ঋণের (ব্যবসায়িক ঋণ, গৃহ নির্মাণ/জমি বন্ধকী ঋণ, উচ্চ শিক্ষা ঋণ, স্থায়ী আমানতের বিপরীতে ঋণ) কিস্তি ও সুদ নিয়মিত প্রদান করতে হবে এবং এইচডিপিএস, শর্ট টার্ম এইচডিপিএস এণ্ড পেনশন স্কিম প্রতি মাসের ১০ তারিখ ও মিলিয়নিয়র স্কিম প্রতি মাসের ১৫ তারিখে সমূদয় অর্থ জমা প্রদান করতে হবে। কোন সদস্য-সদস্যা কোন মাসে কিস্তি খেলাপী হলে পরবর্তী মাসে ঋণের সুদ ও জরিমানা ধার্য হবে এবং উল্লিখিত সকল স্কিমের সমূদয় অর্থ নির্ধারিত তারিখে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে জরিমানা আদায় করা হবে।

তবে উল্লেখ থাকে যে, ইতোমধ্যে যে সমস্ত সদস্য-সদস্যাগণ ঋণখেলাপী এবং কিস্তিখেলাপী রয়েছেন তারা **সোসাইটির ১ জুন থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ঘোষিত সেবাকালে ঋণ পরিশোধের বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।**

উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল
সেক্রেটারি
দি এমসিসিএইচএস লিঃ

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.1978

তারিখ : ২৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

তথ্য হালনাগাদ সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা 'দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ' এর সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, হিসাবের যাবতীয় লেনদেন সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষে তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আরও উন্নত সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয়তায় সকল সদস্য-সদস্যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন এর ফটোকপিসহ সোসাইটির নির্ধারিত ফরম সংগ্রহপূর্বক পূরণ করে প্রধান কার্যালয়সহ সকল সেবাবুথ সমূহে অতিসত্ত্বর জমা দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রে ও জন্মনিবন্ধনে লিপিবদ্ধ নাম ও ঠিকানা অনুসারেই তথ্য হালনাগাদ করণ করা হবে। বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বসহকারে নিয়ে ফরম পূরণ করে যথাসময়ে সকল সদস্য-সদস্যাদের জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায়, সোসাইটিতে রক্ষিত পুরাতন তথ্যসমূহ তথ্য ও প্রযুক্তির দ্বারা লেনদেন সংক্রান্ত কোনরূপ বিঘ্ন ঘটলে সোসাইটির সংশ্লিষ্ট বিভাগ দায়ী নয়।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল
সেক্রেটারি
দি এমসিসিএইচএস লিঃ

বিজ্ঞ/১৮৪/২১

Job Opportunity

World Concern Bangladesh, an International Non-Government Organization has microcredit programs, education programs, child rights program, disaster risk reduction program, integrated development programs, capacity building and organizational development program both in rural and urban areas. We are searching some energetic, smart & potential candidates for the following key positions for its new **Integrated Development Project (IDP)** for **Shuhilpur Union** under Brahmanbaria district:

Sl No.	Details of Positions	Necessary Requirements
01.	• **Name of Position: Project Manager (01)** • **Job Location: Project Office based.** • **Age:** 35 – 50 years • **Salary:** As per Salary Scale of the organization. **Additional Job Requirements:** • Training on Project Management, Approach to Rural Development, Communication, Advocacy & Networking, Financial Management etc. • Ability to drive motor-cycle with valid driving license. • Report Writing Skills (English & Bangla). • Computer Operating Skill on MS Office.	• **Educational Qualification:** Post Graduate in Social Welfare, Sociology, Social Science, Political Science, Management or any relevant subject from any reputed University. • **Experience Needed:** 8-10 years working experience in integrated project management in a reputable organization on integrated social development. **Role of the position :** • To provide leadership, direction and moral support to the program related staff for effectively achieving the set goals and objectives of the program. **Key Responsibilities:** • Develop, Operate & ensure IDP project as per plan. • Social empowerment of the poor and their institutions (groups). • Transform and integrate the ultra poor into the main stream of development. • Conduct baseline survey.
02.	• **Name of Position: Project Officers (02)** • **Job Location: Project Office based.** • **Age:** 25 – 35 years • **Salary:** As per Salary Scale of the organization. **Additional Job Requirements:** • Training on Training of Trainers (ToT), Advocacy & Networking, and Management & Communication. • Ability to drive motor-cycle with valid driving license. • Report Writing (English & Bangla). • Computer Operating Skill on MS Office.	• **Educational Qualification:** Post Graduate in Social Welfare, Sociology, Social Science, Political science, Management or relevant subject from any reputed University. • **Experience Needed:** 3-5 years working similar experience in integrated project or community development in a reputable organization. **Key Responsibilities:** • Provide direction and leadership to Volunteers for implementation of the social development activities. • Organize and conduct training & workshop for group and community people. • Develop monthly work plan, setting quarterly, half yearly and annual target and implement the activities to achieve the target.
	• **Name of Position: Monitoring & Evaluation Officer (01)** • **Job Location: Country Office at Dhaka** (Frequent Field Visit) • **Age:** 30 – 45 years • **Salary:** As per Salary Scale of the organization. **Additional Job Requirements:** • In-depth knowledge on MIS, M&E and development issues. • Knowledge on M&E software. • Excellent communication skills (written and oral). • Expertise in analyzing data using statistical software.	• **Educational Qualification:** Post Graduate in Statistics, Social Science, Management or relevant subject from any reputed University. • **Experience Needed:** At least 5 years of similar experience in a reputable organization. **Key Responsibilities:** • To design appropriate monitoring methodologies, tools and techniques both for qualitative and quantitative aspects; • To monitor project activities, expenditures and progress towards achieving the project output; • To monitor project according to project logical framework and recommend further improvement of the logical frame work if needed; • To monitor and evaluate overall progress on achievement of results.

Application Procedures:

Interested candidates are requested to apply with a Full Resume with two professional references, 01 copy of passport size photograph and copies of all academic & experience certificates including copies of NID Card directly to the following **E-mail Address: wcbcohrd@gmail.com on or before 16th July 2021**. Hard copy will be ignored.

Note: Recruitment will be finalized based on approval of project by donor and NGO Affairs Bureau.

বিজ্ঞ/১৮৬/২১

সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রাণপ্রিয় মা সুপ্তি মেলেন্ডা গমেজ (স্বর্ণা)

জন্ম : ১৬ জানুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ জুলাই, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই বেদনাবিধুর দিন ৪ জুলাই, যেদিন তুমি সকলকে অবাক করে দিয়ে চলে গেলে পিতার কাছে। তোমাকে আমরা ভুলবো না। ভুলতে পারবো না কোনদিন। প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি মুহূর্তে তুমি আমাদের সাথে মিশে আছো। তোমার সেই হাসিমাখা সরলতা ও সবকিছু আমাদের হৃদয়ে মিশে আছে। আমাদের কখনো মনে হয় না তুমি আমাদের মাঝে নেই। মনে হয় এইতো তুমি আছো আমাদের মাঝে। মনে হয় ডাকলেই তুমি দৌড়ে আসবে পাশের বাড়ি থেকে। তবে প্রার্থনা করি তুমি যেখানে থাকো, ভাল থাকো ও স্বর্গের ফুল হয়ে থাকো। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা সবাই তোমার ভালবাসায় থাকতে পারি।

বাবা	:	সুশীল গমেজ	দিদা	:	জুলিয়েট রোজারিও
মা	:	শিউলী গমেজ	ঠাকুরমা	:	মেথেল্ডা গমেজ
বোন	:	সীথি গমেজ	দাদা	:	প্রয়াত ডানিয়েল গমেজ

হাসনাবাদ, (ভক্তবাড়ি)

BOOK POST

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"তুমি ছিলে, আছো, থাকবে আমাদের হৃদয়ে"

প্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেলো, গত বছর ৪ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ দুপুর ১২টায় হঠাৎ করেই হাজারো মানুষের ভালোবাসা উপেক্ষা করে আমাদের সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তুমি চলে গেলে পরম পিতার গৃহে। তোমার এই চলে যাওয়াটা কিছুতেই মানতে পারছি না বাবা। এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারি না তুমি আমাদের মাঝে নেই। সর্বক্ষণ তোমার পদচারণা অনুভব করতে পাই। তোমারতো এভাবে, এত অল্প বয়সে চলে যাওয়ার কথা ছিলো না। তুমি ছিলে একজন আদর্শ শিক্ষক, হাজারো মানুষ গড়ার কারিগর, সৎ, পরিশ্রমী, ধর্মপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, সাহসী, নিষ্ঠাবান, অন্যায়ের প্রতিবাদী, সহিষ্ণুশীল, দৃঢ়চেতা, বন্ধুসুলভ ও শিল্পীমনা একজন আদর্শবান বাবা। ঈশ্বরের কাজে সর্বদা তুমি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছো। এই সমাজের ও মণ্ডলীর জন্য তোমাকে অনেক বেশি প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু মহামারী COVID -19 এর কাছে তুমি হেরে গেলে। সবাই অনেক আশাবাদী ছিলাম তুমি ফিরে আসবে। কিন্তু মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে আমাদের ছেড়ে তুমি চলে গেলে স্বর্গধামে। তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের অনেক কষ্ট দেয়। বার বার তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠে। তুমি বেঁচে আছো, বেঁচে থাকবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে তোমার ভালোবাসায়, কর্মে, আমাদের প্রতিটা নিঃশ্বাসে, মনে প্রাণে ও হৃদয়ের মণিকোঠায়। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তুমি পরম পিতার কাছে আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের আশির্বাদ কর আমরা যেন তোমার আদর্শ অনুসরণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি ও তোমার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ স্বপ্ন গুলো বাস্তবায়ন করে একদিন পিতার গৃহে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে চির শান্তি দান করুন।

প্রয়াত নয়ন গিলবার্ট রোজারিও (নয়ন স্যার)
জন্ম : ২ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

তোমার অতি আদরের সন্তান
কথা, শান্ত ও অমিয় রোজারিও
স্ত্রী: কৌশল্যা পিউরীফিকেশন
মা: মেরী রোজারিও
পূর্ব রাজাশন, সাভার-ঢাকা।

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School
Govt. Reg. No. 23/English
(Play Group to O' Level)
Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

Admission going on
2021-2022
Main Campus (Play-O' Level)
Savar Campus: (Play-Std: VI)
Session: July 2021- June 2022
Online Class Running

Dhaka Campus
Bangladesh Baptist Church, 78-D/1, Indira Road,
(West Raiabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Website: www.wcischool.org, Contact Number: +88 02 9112949, 01989283257

Savar Campus
National YMCA International Building
B-2, Jaleswar, Radio Colony
Bus Stand (পশ্চিম), Savar

Our Facilities:
- Air Conditioned Classrooms.
- Secured with CCTV Camera.
- Wide playground and newly constructed school building.
- Use of modern teaching methodology. Computer, Multimedia, Internet etc.
- Arrangement of indoor and outdoor games.
- Special Care for slow learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Bus Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org